শাশ্বত ভারত

—দ্বিতীয় খণ্ড—

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী
(স্থাপিত ১৮৭৭ খৃঃ)
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৫ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২

নিবেদন

শাশ্বত ভারত (২য় খণ্ড) প্রকাশিত হোলো।

এই গ্রন্থখানি ও এর লেখক সম্বন্ধে আমাদের কিছু নিবেদন আছে।

লেখক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় সুধী সমাজে সুপরিচিত। একজন প্রবীণ শিক্ষাব্রতী হিসাবে ও একাধিক ভূগোলের বই লিখে ইনি যশস্বী হয়েছেন। ভারত-পুরাতত্ত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়েও দীর্ঘকাল যাবত ইনি পড়াশুনা ক'রে আসছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি দিক লেখক এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

বিরাট এই দেশ ভারতবর্ষ। বহু-বিচিত্র এর লোকজন। ভাষায় এদের মধ্যে বিভিন্নতা। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, খাওয়া পরা—বিভিন্নতা এ সব নিয়েও। তবুও কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা, আর গুজরাট থেকে মনিপুর পর্যন্ত এই বিরাট ও বিচিত্র দেশের অগণিত লোকজনের মধ্যে এক বিষয়ে একতা লক্ষ্য করা যায়। আবহমান-কাল থেকে এ দেশের সর্বত্রই স্বর্গের দেবতায় আর মর্ত্যের মানুষে একসঙ্গে মিলে নানা ধরণের অপূর্ব লীলাবিলাস ক'রে এসেছেন; এখনও সমানে ক'রে চলেছেন। ভারতের মানুষ দেবতাকে পরম আত্মীয়, আপনজন বলেই মনে করে। আর, স্বর্গের দেবতাদেরও এই দেশের মানুষের সঙ্গে মিশতে কত না আনন্দ! তাঁরা স্বর্গ থেকে নেমে আসেন এই ধূলিধূসর মর্ত্যে। তাঁদের কেউ হন পিতা, কেউ মাতা, কেউ পুত্র, কেউ কন্যা, কেউ বা ভ্রাতা ভগিনী সখা বা সখী। শুধু কি তাই? ভারত ভূমিতে তাঁরা ভারতবাসীর দাসী এমন কি স্ত্রীরূপেও লীলাবিলাস করেছেন। বড় মধুর এইসব লীলা কাহিনী!

এ-সব কাহিনী কারও কাছে হয়ত হাস্যকর মনে হ'তে পারে। কারও কাছে অনৈতিহাসিক। কারও কাছে বা অবৈজ্ঞানিক।

তা হোক। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ এ-সব কাহিনী সত্য বলেই মনে করে। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, 'মা' এসে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; শাঁখারির কাছ থেকে শাঁখা চেয়ে নিয়ে হাতে পরেছিলেন; সুদূর বৃন্দাবন থেকে উৎকলে এসে প্রস্তর-বিগ্রহ বিবাদে সাক্ষ্য দিয়ে সে বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

আরও এক কথা। এইসব মধুর কাহিনী অবলম্বন ক'রে দেশের এক এক স্থানে এক একটা প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ কিছু গ'ড়ে উঠেছে। কোথাও বা মন্দির নির্মিত হয়েছে। কোথাও বা বছরে বছরে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গীত গোবিন্দ, কৃষ্ণ-কর্ণামৃত জাতীয় কত অমূল্য গ্রন্থ-ই না লেখা হোলো! আবহমানকাল থেকে অগণিত লোক এইসব মন্দিরে, মেলায় এসেছেন, এখনও আসছেন; পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এই-সব বই পড়ছেন। এর মধ্যে বিশ্বাসের অণুমাত্র শিথিলতা নেই।

এ-সব শুধু সত্যই নয়, অমূল্য সম্পদ। এইসব না জানলে দেশকে খাঁটিভাবে চেনা-ই সম্ভব নয়। দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এ-সবের মূল্য তাই অপরিসীম, অপরিমেয়। কোনও ইতিহাস, কোনও জাতি এইসব সম্পদকে উপেক্ষা করতে পারে না।

দেবতায় আর মানুষে গড়া এই জাতীয় কত কাহিনী ভারতের এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে! খুঁজলে ভারতের সকল জায়গা থেকেই অসংখ্য এই জাতীয় লীলা-কাহিনী আহরণ করা যাবে।

লেখক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এই সব লীলা-কাহিনী পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আহরণ ক'রে চলেছেন বহুকাল যাবত।

লেখকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পরলোকগত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে বহুদিন ধ'রে উৎসাহিত করেছেন; নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

অধ্যাপক বসু এইসব কাহিনীগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে লেখককে অনুরোধ করেন। আর, এই বই প্রকাশিত হ'লে নাম রাখতে বলেন 'শাশ্বত ভারত'। তাঁর মতে এই-ই হোলো ভারতের শাশ্বত বা চিরন্তন রূপ।

আচার্য ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী এই বই-এর পাণ্ডুলিপি প'ড়ে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমরা একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, লেখক ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা-বিলাস বর্ণনার যথার্থ অধিকারী। তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের গুণে প্রত্যেকটি কাহিনীই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠেছে।'

আমরাও এ-বিষয় আচার্য সেনশাস্ত্রীর সঙ্গে এক মত। আচার্য সেনশাস্ত্রীর মতো আমরাও মনে করি, 'আজকের এই বিপর্যয়, প্রমত্ততা, বিভ্রান্তি ও স্বধর্মভ্রষ্টতার যুগে' এই গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আমবা তাই আনন্দের সঙ্গে এই গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছি। সঙ্কল্প করেছি, খণ্ডে খণ্ডে বইখানি প্রকাশ করবো।

আনন্দের কথা এই, বইখানির প্রথম খণ্ড বের হবার পর বহুগুণীজন অযাচিতভাবে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও এর খুবই সুখ্যাতি বেরিয়েছে।

এদেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। শিক্ষিত বলতে যা বলা হয় তার মধ্যেও বিরাট অংশ অতি সামান্য লেখাপড়া জানে। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা এদেশে একেবারেই নগণ্য। অথচ অল্প-শিক্ষিত, নিতান্ত সাধারণ লোকজনের উপযোগী বই এই দেশে কয়খানা আছে —কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকখানা ছাড়া? প্রায় সব বই-ই তো সংখ্যায় নিতান্ত অল্প— একেবারেই নগণ্য-সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিতদেরই উপযোগী করে লেখা।

লেখক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় কথকতার ভঙ্গীতে সহজ সরল ভাষায় জনসাধারণের একান্ত উপযোগী ক'রে 'শাশ্বত ভারত' বইখানি লিখেছেন। পড়লে মনে হবে যেন সাধারণ স্ত্রীপুরুষ দর্শকদের সামনে গলায় মালা প'রে হেলে দুলে কথক ঠাকুর কথকথা শোনাচ্ছেন। ঠিক কথকতার মতোই এই বই-এর মাঝে মাঝে প্রামাণিক গ্রন্থ বা লোকগাথা থেকে প্রাসঙ্গিক সহজ উদ্ধৃতি রয়েছে। কোথাও বা রয়েছে সুন্দর সুন্দর গান। বইখানি পড়বার সময় বা শোনবার সময় প্রতি ঘটনাই চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। এইটি-ই বইখানির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ঠ্য। যুগান্তর লিখেছেন, 'তাই ইচ্ছে হয়, এক নিঃশ্বাসেই বইখানি শেষ ক'রে ফেলি'।

পরিশেষে নিবেদন, এটি লেখকেরও নিবেদন, এই বই-এ কোনও ত্রুটি বা ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করলে, আমাদের জানালে তা সংশোধন করতে দ্বিধা আসবে না। তার জন্যে আমরা উভয়েই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। ইতি—

প্রকাশক

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান মাণিক চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
মদনগোপাল ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য	...	...	১
মদনগোপাল ও শ্রীসনাতন গোস্বামী	...	...	১৯
তারা মা ও বামাক্ষ্যাপা	...	...	৪৪
গোস্বামী শ্যামানন্দ	...	...	৮৪
সাধক কমলাকান্ত	...	...	১০৬
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, বিঠ্ঠল নারায়ণ ও জনৈক যুবক	...	...	১২৯
ঠাকুর সর্বানন্দ	...	...	১৩৭
দেবী রাজবল্লভী	...	...	১৬১
কৃষ্ণদাস বাবাজী	...	...	১৭০
শ্রীরামচন্দ্র ও তুলসীদাস	...	...	১৮০

শাশ্বত ভারত (২য় খণ্ড) লিখতে নিম্নলিখিত অমূল্য গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি। এইসব গ্রন্থের লেখকদের আমি প্রণাম জানাই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সপ্ত গোস্বামী—সতীশচন্দ্র মিত্র

ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়

মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় সাহিত্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান

— হরিদাস দাস

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা— জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

বামাক্ষ্যাপা— যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তারাপীঠ ভৈরব স্থশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধক কমলাকান্ত—বলাইদাস ভক্তিবিনোদ সাহিত্যরত্ন

শ্রীশ্রীসদ্ভাব তরঙ্গিণী—ভুলুয়া বাবা

সম্ভবামি যুগে যুগে—ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

সর্বানন্দ তরঙ্গিণী শিবনাথ ভটাচার্য

রামচরিত মানস – সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক বাঙলা অনুবাদ

রামচরিত মানস—গীতা প্রেস (গোরক্ষপুর)

বিনয় পত্রিকা— ,,

দোঁহা (তুলসীদাস) ,,

হুগলীর ইতিহাস—স্থধীরকুমার মিত্র

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।
নাম করো নাম করো নাম করো সার ।
কলিকালে নাম বিনা গতি নাহি আর ।।

নাম করলে, কৃষ্ণ নাম করলে কি হয় ?

কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয় ।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ।।
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নয় ।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয় ।।

পাপক্ষয় হবে, ভালো কথা। মোক্ষ-লাভ? প্রয়োজন বোধ করিনে। সে যেমনই হোক বা না হোক, তাঁর পদে মতি হোক—এই একমাত্র কামনা। কর্মের বিপাকে যেমনই গতি হোক না কেন, তার জন্যে ভাবিনে। একমাত্র মিনতি এই—

কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ ।
করম বিপাক গতাগত পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ।।

প্রভু, তোমার প্রসঙ্গে, তোমার কথায়, তোমার নামে যেন সর্বদাই মতি থাকে।

বাসুদেব-কথাপ্রশ্নঃ পুরুষান্ ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং-শ্রোতৄন্ তৎপাদসলিলং যথা॥

শ্রীভগবানের পাদসলিল যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, তেমনি ভগবান বাসুদেবের কথা-প্রসঙ্গও তিন পুরুষকে পবিত্র করে। এই তিন পুরুষ হোলো—যিনি সে বিষয়ে বলেন, যিনি সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন আর যাঁরা শ্রদ্ধাভরে সে বিষয় শ্রবণ করেন।

ভগবানের পাদসলিল স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী, এই ত্রিধারায় প্রবাহিত।

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতা ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥—শ্রীচৈতন্য

হে জগদীশ্বর, আমি ধন চাইনে, জন চাইনে, সুন্দরী নারী বা কাব্য-প্রতিভা চাইনে (অথবা, সুন্দরী অথবা মনোহারিণী কবিতা চাইনে)। আমার জন্মে জন্মে তোমার প্রতি যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

মদনগোপাল ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য

প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের পরেই এঁর স্থান।

এই দুইজন ছাড়া, প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্যই সবচেয়ে সম্মানিত মহাজন, সবচেয়ে পূজনীয় বরণীয় বৈষ্ণব।

জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
জয় শ্রীগুরু বৈষ্ণব আর ভাগবত গীতা॥

শ্রীসীতা দেবী হলেন অদ্বৈত-ঘরণী।

প্রথম জীবনে শ্রীঅদ্বৈতের নাম ছিল কমলাক্ষ—কমলাক্ষ মিশ্র।

এঁর পিতার নাম কুবের তর্কপঞ্চানন। মায়ের নাম লাভা দেবী।

আদি বাড়ী এঁদের শ্রীহট্টে লাউড় গ্রামে। বর্তমানে সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নবগ্রামে।

কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন একজন শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত। পরম ধর্মপরায়ণ।

কমলাক্ষের জন্ম শ্রীহট্টে। জন্ম হয় আনুমানিক ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে।

শিশুকাল থেকেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় অপূর্ব ভক্তি-পরায়ণতা। পূজা অর্চনা নিয়েই কমলাক্ষের দিন কাটে। ছেলে বয়স থেকেই পূজোয় বসলে কমলাক্ষের চোখ দিয়ে নির্গত হ'তে থাকে ধারায় ধারায় অশ্রু।

কমলাক্ষ বড় মেধাবী। কেউ কেউ বলেন, কমলাক্ষ শ্রুতিধর। একবার যা শোনে তাই-ই মনে থাকে। সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। বিদ্যাচর্চায়ও কমলাক্ষের প্রগাঢ় অনুরাগ।

বয়স যখন মাত্র বারো, তখন পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন কমলাক্ষকে বিদ্যার্জনের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিপুরে। কয়েক বছরের মধ্যেই কমলাক্ষ বেদ বেদান্ত স্মৃতি ষড়্দর্শন আয়ত্ত ক'রে ফেললেন। সবাই এঁর পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো।

এই সময়ে পিতামাতা চলে এলেন শ্রীহট্ট থেকে। পুণ্য ভাগীরথী-তীরে শান্তিপুরে ও নবদ্বীপে বাস করতে লাগলেন। কমলাক্ষ পিতা-মাতার কাছেই রইলেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর কমলাক্ষ স্থির করলেন, গয়াধামে গিয়ে উভয়ের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ক'রে আসবেন।

গয়ার কাজ শেষ ক'রে কমলাক্ষ বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি পর্যটন করতে। এই সঙ্গে বৃন্দাবনও ঘুরে আসবেন মনস্থ করলেন।

এই সময়ে তিনি একদিন মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের এক ধর্মসভায় নারদীয় সূত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিতে লাগলো সারা দেহে। অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।

অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার? সে আবার কেমনতরো?

কৃষ্ণভাবে চিত্ত ভাবিত হলেই চিত্তকে বলে সত্ত্ব। এই সত্ত্ব থেকে যে মধুর ভাব সঞ্জাত হয়, তাই-ই সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাবে আট রকম অবস্থা ঘটে। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু আর মূর্ছা।

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে—ইতি উতি ধায়॥

স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য॥
এই ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥

এই সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ তখন কমলাক্ষে।

সমাগত সাধুজনেরা বলাবলি করতে লাগলেন, কে এই মহাজন? সাত্ত্বিক বিকারে আবিষ্ট এঁকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

সত্যই কমলাক্ষের সর্বদেহ তখন পুলক-পরিপূর। কখনো কাঁপছে থরথর ক'রে। কখনো বা শরীর থেকে স্বেদ নির্গত হচ্ছে। দেহ বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে কখনো। কখনও বা কথা কইছেন গদগদ অবস্থায়। কখনও বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হ'য়ে গেলো বুঝি। কিন্তু সব মিলে—সব মিলে আনন্দ-চমৎকার।

দক্ষিণ ভারতের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্ন্যাসী হলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। তাই কেন? সারা ভারতেরই তিনি একজন সর্বজন পূজনীয় মহাত্মা। মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন সেখানে। কমলাক্ষের এই রকম ভাবাবেশ দেখে তিনি পুলকিত হলেন। বুঝতে পারলেন

শুদ্ধ প্রেমাসব ইঁহো করিয়াছে পান।
অন্তর্নিত্যানন্দ ইহার নাহি বাহ্য জ্ঞান॥
ইঁহার শরীরে মহাপ্রভুর লক্ষণ।
জগতে তারিতে বুঝেঁ হৈলা প্রকটন॥

সমাগত মহাত্মারা উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি দিতে লাগলেন।

হরিবোল, হরিবোল। হরিবোল, হরিবোল।......

হরি-নাম শুনে সম্বিৎ ফিরে এলো কমলাক্ষের। কমলাক্ষ চোখ মেলে তাকালেন।

দেখলেন, তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পরম ভাগবত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী।

কমলাক্ষ পূর্বেই শুনেছেন মাধবেন্দ্রের নাম। জানেন তাঁর কথা।

মাধব পুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেই ক্ষণ ॥
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
দণ্ডেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার ॥

স্নেহভরা দৃষ্টিতে মাধবেন্দ্র কমলাক্ষকে অভিষিক্ত করলেন।

মাধবেন্দ্র পুরীকে দর্শন ক'রে কমলাক্ষ কৃতার্থ হলেন। লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চরণে।

প্রভু, বহুদিন হ'তে একান্ত বাসনা, কবে আপনার দর্শন পাবো? কবে আপনার কৃপালাভে জীবন ধন্য করবো? আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। প্রভু, আমায় কৃপা করুন। আমি আপনার শ্রীচরণে শরণ নিলাম।

মাধবেন্দ্র কমলাক্ষকে আলিঙ্গন করলেন।

কৃষ্ণপ্রেম লাভ করো, বৎস। তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হোক।

দিন যায়।

মাধবেন্দ্র কমলাক্ষের আকুল প্রার্থনায় তাঁকে নিজের কাছে রাখলেন কিছুকাল। বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রের বহু গূঢ় কথা তাঁকে শোনালেন। বহু গূঢ় তত্ত্ব তাঁকে শেখালেন। সাধ্য সাধনতত্ত্ব সুন্দর ক'রে তাঁকে বোঝালেন।

মাধবেন্দ্রের কৃপাবলেই কমলাক্ষ হয়ে পড়লেন কালে সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম। হলেন মহত্তম বৈষ্ণবদের একজন।

একদিন কমলাক্ষ একান্তে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে নিবেদন করলেন, প্রভু, এই ঘোর কলিকালে জীবের দুর্গতি দেখে বড়ই ব্যথা পাই। বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ি। ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। আজ সেই মানুষ অধঃপতিত। তার সামনে কোনও আদর্শ নেই। ধর্ম থেকে সে বিচ্যুত। ভুবন-মঙ্গল হরিনাম তার মুখে আজ আর

উচ্চারিত হয় না। কলুষ-নাশন শ্রীকৃষ্ণের নাম কেউ করে না। আমায় উপদেশ দিন, প্রভু, কিসে মানুষের পরিত্রাণ হবে? আমার ভবিষ্যৎ কর্তব্যই বা কি?

বৎস কমলাক্ষ, সুবিপুল এই পাপরাশি যিনি উন্মূলন করতে সক্ষম, সেই পরম প্রভুর আবির্ভাব না ঘটলে তো তা সম্ভব হবে না। তুমি প্রকৃত ভক্ত। জীবের কল্যাণ কামনা ক'রে সেই করুণাময় প্রভুকে বারংবার ডাকো। জানাও আকুল আহ্বান। জাগ্রত ক'রে তোলো তাঁকে। তাঁকে ধরাধামে অবতীর্ণ করাও। এ ভার তুমিই নাও, বৎস।

মাধবেন্দ্র পুরীর এ উপদেশ কমলাক্ষ অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

তাই হবে, প্রভু। আমি নিশ্চিত জানি, আপনার আশীর্বাদ থেকে কখনও বঞ্চিত হবো না। আজ থেকে সেই পরম প্রভুকে আবাহন করা, তাঁকে ধরাধামে অবতীর্ণ করানোই হবে আমার জীবনের ব্রত।

তোমার সঙ্কল্প সার্থক হোক, বৎস।

কয়েক দিনের মধ্যে কমলাক্ষ আবার বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ পর্যটনে। পশ্চিম ভারতের তীর্থগুলি দর্শন ক'রে তিনি এলেন বৃন্দাবনে।

শ্রীবৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বাসস্থান। বৃন্দাবন পুরী মাধুপুরী বরা। বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ পুরী।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবন পুরী।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে অর্জুন, ত্রিলোকে পৃথিবী ধন্যা যেহেতু তাতে বৃন্দাবন আছে।

কমলাক্ষ বৃন্দাবনে এলেন।

রাধা কৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থলী দেখেন আর ভাবে উদ্বেল হ'য়ে পড়েন কমলাক্ষ। কখনও ভূমে গড়াগড়ি দেন। কখনও বা অশ্রুর বন্যায় ব্রজের রজ সিক্ত ক'রে তোলেন।

দিন কেটে যেতে লাগলো এমনি ভাবে।

একদিন কমলাক্ষ এলেন গিরি গোবর্ধনে। এখানে এসে তিনি আনন্দে বিভোর হ'য়ে পড়লেন।

রাত্রি হয়েছে। চারিদিক অন্ধকার। পল্লী নিস্তব্ধ, নির্জন।

কমলাক্ষ এক বটগাছ* তলায় শুয়ে রয়েছেন। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

ঘুমের ঘোরেই তিনি এক স্বপ্ন দেখলেন। মধুর স্বপ্ন।

দশ দিক উজ্জ্বল ক'রে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। নয়নাভিরাম তাঁর রূপ। ত্রিলোকমোহন।

মনোহর বংশীবদন বনমালী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠামে, চূড়ার টালনি বামে,
আর তাহে অলকা আবলী॥
বরণ চিকণ কালা, তাহে শোভে বনমালা,
পীতাম্বর পরিধান করি।
কিবা সে মুরতিখানি, অপরূপ লাবনি,
কালো নহে জগমনোহারী॥

মরি-মরি! মরি-মরি!

স্নিগ্ধ মাধুর্যের অমৃত স্রোতে দশদিক ভেসে গেলো। দিব্যভাবে কমলাক্ষের হৃদয় ভ'রে উঠলো।

কমলাক্ষ বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। প্রণাম করতে পারলেন না। চোখের পলক পড়লো না। তাকিয়ে রইলেন এক-দৃষ্টে। আনন্দের আকুলতায় দুচোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

---

* সেই বটগাছটি এখনও আছে। নাম 'অদ্বৈত বট'। যমুনাতীরে দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে এটি রয়েছে।

বিশ্বের সকল সুধা কণ্ঠে এনে সুস্মিতবদন ব্রজেশ্বর তখন বললেন,

কমলাক্ষ, তোমার সঙ্কল্পের কথা জানি। তুমি মাধবেন্দ্রের নির্দেশিত পথেই সাধনা ক'রে চলো। দ্বিধা এনো না। বিশ্বাস হারিও না। শঙ্কার কোনও কারণ নেই। অচিরেই তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে। প্রেমভক্তির বন্যায় আবার ধরণী প্লাবিত হবে। ভুবন-মঙ্গলের মধুর নাম আবার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হবে। শুভলগ্নের আর বিলম্ব নেই। জেনো, তুমি আমার প্রিয়, একান্ত প্রিয়।

আর এক কথা, কমলাক্ষ।

দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে যমুনাতীরে আমার এক বিগ্রহ রয়েছে। বিগ্রহের নাম মদনমোহন।

দ্বাপরে শ্রীমতী কুব্জা আমার এই মূর্তির সেবা করেছিলো। বিগ্রহটি যমুনাতটে মাটির নীচে লুকানো রয়েছে। তুমি এই বিগ্রহের উদ্ধার করো। এব সেবার ব্যবস্থা কবো।

কমলাক্ষের আব নিদ্রা হোলো না। সারারাত নিমজ্জিত রইলেন আনন্দরস-সমুদ্রে।

শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিয়েছেন!

জীবনে এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন কমলাক্ষ।

হোক্ না সে স্বপ্নযোগে দেখা! তবুও সে যে দুর্লভ দর্শন!

বিশ্ববিমোহন সেই রূপ কমলাক্ষের চোখের সামনে অনুক্ষণ ভাসতে লাগলো। নিমেষের তরেও অদৃশ্য হোলো না।

কমলাক্ষ প্রাণ ভ'রে দেখতে লাগলেন। দেখতেই লাগলেন। আহা!······

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর ;
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর ;
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিক ব্যাপে যার পুর ॥

ভোর হোলো।

কমলাক্ষের আনন্দ ধরে না। অপার আনন্দে গাঁয়ের সবাইকে জাগিয়ে তুললেন। জানালেন সবাইকে গতরাত্রের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

তোমরা ভাগ্যবান। শ্রীকৃষ্ণের এক বিগ্রহ এখানে আছেন। শ্রীমতী কুব্জা দ্বাপরে যে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের আরাধনা করতেন, সেই বিগ্রহ। তোমরা আজ তাঁর দর্শন পাবে। তিনি মাটির নীচে রয়েছেন। চলো যাই। তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনি।

গাঁয়ের লোকেরা পরম আনন্দে ছুটলো দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থের দিকে। স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ সবাই। চলো চলো।

চলো চলো।

এ বলে ওকে, চলো চলো। ও বলে একে, চলো চলো।

সবারই মুখে আনন্দ, অন্তরে উৎসাহ।

আজ ঠাকুর দেখা দেবেন! আজ ঠাকুর দেখা দেবেন!

চলো চলো।

খনন শুরু হোলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই স্বপ্নবর্ণিত স্থানে প্রকটিত হলেন ভুবন-মনোহর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।

আনন্দ ধরে না গ্রামবাসীদের। আনন্দের সীমা নেই কমলাক্ষের। উৎফুল্ল হ'য়ে সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

জয় মদনমোহন! জয় মদনমোহন!...

আনন্দে কেউ নাচতে লাগলেন। কেউ ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। কেউ বা ঠাকুরের অপার করুণা দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন। অনেকেই ঠাকুরকে স্তব করতে লাগলেন।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

শুভদিনে কমলাক্ষ অসংখ্য লোক-সমাগমের মধ্যে মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা করলেন। একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ নিয়ে এলেন খুঁজে। তাঁর উপর শ্রীবিগ্রহের সেবার ভার অর্পণ করলেন।

কমলাক্ষের কাজ শেষ হোলো। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে চলে এলেন। রইলেন মদনমোহন ক্ষুদ্র এক কুটিরের মধ্যে।

ঠাকুরকে তোলা হয়েছে মাটির নীচে থেকে। অপূর্ব সুন্দর ঠাকুর। তাই মদনমোহনকে দেখতে দলে দলে লোক আসতে লাগলো। সব সময়েই লোকের ভীড়। সর্বক্ষণেই জয়ধ্বনি।

জয় মদনমোহন! জয় মদনমোহন!......

একদল পাঠানের নজর পড়লো এই দিকে। তারা পছন্দ করলো না পাথরের একটা মূর্তি নিয়ে এত হৈ চৈ! এত সমারোহ!

একদিন তারা এলো মদনমোহন বিগ্রহ নিয়ে যেতে। বিগ্রহটিকে তারা হয়ত অপবিত্র করবে। ধ্বংস করবে।

পাঠানরা এলো। কুটিরে প্রবেশ করলো।

কিন্তু আশ্চর্য! বিগ্রহ নেই! কে যেন দ্রুতবেগে সে বিগ্রহ সরিয়ে ফেলেছে!

নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেলো পাঠানরা। বিগ্রহ ধ্বংস করা গেলো না।

এতক্ষণ পূজারী ওখানে ছিলেন না। তিনি যমুনায় স্নানতর্পণে রত ছিলেন। পাঠানদের হামলার কথা শুনেই ছুটে এলেন। দেখলেন বেদীতে শ্রীবিগ্রহ নেই।

কী সর্বনাশ! হায় হায়!

তবে কি পাঠানরা বিগ্রহ নিয়ে গিয়েছে? কিংবা বিগ্রহকে জলে ফেলে দিয়েছে? কিংবা অপবিত্র ক'রে ধ্বংস ক'রে ফেলেছে?

দুঃখে বেদনায় পূজারী কাঁদতে লাগলেন।

নিমেষে এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

কমলাক্ষ ছুটে এলেন। দুই চোখে তাঁর অশ্রুর বন্যা।

খুঁজে চলেছেন বিগ্রহ। স্নান নেই। আহার নেই। খুঁজেই চলেছেন কমলাক্ষ।

বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও বিগ্রহের কোনও সন্ধান পাওয়া গেলো না।

প্রভু, লীলা-সুন্দর, এ আবার তোমার কোন্ লীলা? এতকাল ছিলে মাটির নীচে লুকিয়ে। কৃপা ক'রে আদেশ করলে, আমায় প্রকাশ করো। আমার কী সাধ্য? তুমি নিজেই নিজেকে প্রকটিত করলে! আজ আবার কোথায় গিয়ে লুকোলে? কেন লুকোলে? না জানি, আরও কি লীলা দেখাবার সাধ হয়েছে তোমার, লীলাময়!

কমলাক্ষ ধ্যানে বসলেন।

রাত্রি হোলো। গভীর রাত্রি।

কমলাক্ষ কিছুই খান নি। রুচি নেই।

সেই বটগাছের নীচেই শুয়ে পড়লেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যে কমলাক্ষ পড়লেন ঘুমিয়ে।

এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিলেন। স্নেহমধুর কণ্ঠে বললেন,

কমলাক্ষ, কেন দুঃখ করছো? এত ভাবছো কেন? পাঠানরা আমায় ভেঙ্গে ফেলে নি। অপবিত্রও করে নি। আমি-ই নিজে ছোট্ট একটি বালক সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তারপর চুপি চুপি বাইরে এসে কুটিরের পাশে ফুলবাগানে লুকিয়ে রয়েছি। যাও, সেখান থেকে আমায় উঠিয়ে নিয়ে এসো।

হ্যাঁ, আর এক কথা। আজ থেকে আমার এই বিগ্রহের নাম রাখো মদনগোপাল। না, না, মদনমোহন নয়, মদনগোপাল। মদনগোপাল-ই ভালো। আজ থেকে সকলের মনে জাগরূক থাক আমার এই গোপাল লীলা।

আনন্দে অধীর হ'য়ে কমলাক্ষ ছুটে গেলেন ফুলবাগানে। কতবার তো দেখেছেন এ জায়গা! দেখতে পান নি এঁকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখানেই রয়েছেন ঠাকুর! মদনগোপাল!

মদনগোপালকে নিয়ে এলেন বেদীতে।

তোমাদের ঠাকুরের নাম আজ থেকে মদনগোপাল। নিজেই নিজের নাম বদলে নিয়েছেন।—জানালেন কমলাক্ষ সবাইকে।

জয় মদনগোপাল! জয় মদনগোপাল!......

মদনগোপালের পূজা যথারীতি চলতে লাগলো।

আবার একদিন কমলাক্ষ স্বপ্ন দেখলেন।

মদনগোপাল তাঁকে বলছেন,

দেখ কমলাক্ষ, আমার বিগ্রহ যেখানে রয়েছে, সেস্থান সুরক্ষিত নয়। পাঠানরা হয়ত শীঘ্রই আবার আক্রমণ করবে। তুমি এক কাজ করো। মথুরা থেকে দামোদর চৌবে নামে একজন পরম ভক্ত শীঘ্রই এখানে আসবে। তুমি তার হাতেই আমাকে সমর্পণ কোরো। সেখানে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

দুঃখিত হোয়ো না, কমলাক্ষ। হোলোই বা এই বিগ্রহ স্থানান্তরিত। আমি অঙ্গীকার করছি, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অটুট থাকবে চিরকাল।

নিকুঞ্জবনে আমার এক প্রাচীন পট রয়েছে। বিশাখা সখী এই পট রচনা করিয়েছিল। এই পটখানি তুমি দেশে নিয়ে যেও। সেবা কোরো এই পটের। তাতেই আমি সুখী হবো।

পরদিন দামোদর চৌবে এসে উপস্থিত হলেন। তিনিও মদনগোপালের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন।

বৃন্দাবনে কমলাক্ষের কাছে যাও। তার কাছ থেকে আমায় নিয়ে এসো। আমি তোমার ঘরেই থাকবো।

চৌবেজী, তুমি ভাগ্যবান। মদনগোপাল তাঁর সেবার জন্মে তোমাকেই নির্দিষ্ট করেছেন। এমন ভাগ্য কয়জনের ?

কমলাক্ষ দামোদর চৌবেকে মদনগোপাল বিগ্রহ অর্পণ করলেন।

হে লীলাসুন্দর, কী সাধ্য আমার যে তোমার লীলা বুঝতে পারি। বুঝি নাই বুঝি, কৃপাময়, এই কৃপাই কোরো, যেন তোমার কৃপা থেকে কখনও বঞ্চিত না হই। তোমার অপার কৃপার কথা কখনও যেন না ভুলি।

পটখানি নিয়ে কমলাক্ষ শান্তিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

আসবার পথে কমলাক্ষ মিথিলা হ'য়ে এলেন।

মিথিলায় এক বটবৃক্ষমূলে বৃদ্ধ কবি বিদ্যাপতি বিশ্রাম করছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সঙ্গে মিলন হোলো কমলাক্ষের।

বিপ্র কহে মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি।
রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি ॥

কমলাক্ষ তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললেন,

ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল।
তেঁই পদকর্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হইল ॥

কমলাক্ষ এলেন শান্তিপুরে।

কিছুদিনের মধ্যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীও এলেন। এলেন কমলাক্ষের গৃহে।

মাধবেন্দ্র চলেছেন নীলাচলে। মলয় চন্দন সংগ্রহ করতে হবে। তাঁর গোপাল তাঁকে বলেছেন, আমার শরীরে বড়ই জ্বালা। গরমে কষ্ট পাচ্ছি। নীলাচলে চন্দন মেলে। সেখান থেকে চন্দন নিয়ে এসো। আমার সর্বাঙ্গে কর্পূর চন্দন লেপন করো। তাতে জ্বালা কমবে।

বিলম্ব করেন নি। তক্ষুনি রওনা হলেন নীলাচলের উদ্দেশ্যে। যাবার পথে এসেছেন শান্তিপুরে। অপেক্ষা করতে পারবেন না বেশী দিন।

অচিরেই মাধবেন্দ্র দীক্ষা দিলেন কমলাক্ষকে।

কমলাক্ষ ইতিমধ্যে বৃন্দাবনের সব ঘটনার কথাই বলেছেন তাঁকে। বলেছেন পটের কথা। দেখালেন পটখানি।

পটখানি দেখে মাধবেন্দ্রের ভাবাবেশ হ'তে লাগলো। প্রকৃতিস্থ হ'লে তিনি কমলাক্ষকে উপদেশ দিলেন—

পুরী কহে বাছা তুহুঁ শুদ্ধ প্রেমবান।
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করহ নির্মাণ॥
রাধাকৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপী ভাবোদয়।
অতএব যুগল সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়॥

কমলাক্ষ মাধবেন্দ্রের আদেশ অনুযায়ী রাধিকার পট রচনা করালেন।

শুভক্ষণে মাধবেন্দ্র কমলাক্ষের ভবনে রাধামদনগোপালের অভিষেক করলেন। কমলাক্ষ শুরু করলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল-ভজন।

রাধা ও কৃষ্ণের এই যুগল উপাসনা—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তির—অনতিবিলম্বে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ে প্রধান আসন লাভ করলো।

মাধবেন্দ্র কমলাক্ষকে বিবাহ ক'রে সংসারী হ'তে নির্দেশ দিলেন। উপদেশ দিলেন, সংসারে থেকেই কৃষ্ণ নাম প্রচার ক'রে চলো, বৎস।

বিদায় নেবার পূর্বে মাধবেন্দ্র একান্তে কমলাক্ষকে বললেন, বৎস কমলাক্ষ, পরম প্রভুকে আহ্বান ক'রে ধরায় অবতীর্ণ করাবার মুখ্য দায়িত্ব তোমার। এ কথা ভুলো না। আমি তাঁর আবির্ভাবের অপেক্ষায়ই রইলাম।

জাগৃহি ভগবন্! অনাগত দেবতা স্বাগতম্!

কমলাক্ষের একজন শিষ্য ছিলেন। নাম তাঁর পণ্ডিত শ্যামাদাস। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী।

আচার্যের সঙ্গে তত্ত্ব বিচারে পরাজিত হ'য়েই তিনি কমলাক্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন ভক্তিসিদ্ধান্ত।

শ্যামাদাস পণ্ডিতই এই সময়ে কমলাক্ষের নামকরণ করেন—অদ্বৈত আচার্য। হরি সহ অভেদ হেতু নাম হৈল অদ্বৈত'।

অদ্বৈত নাম–ই চালু হোলো।

অদ্বৈত শান্তিপুরে বাস করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন শান্তিপুরের বৈষ্ণবকুল শিরোমণি।

তখন সমাজে বৈষ্ণবদের একটুও আদর ছিল না। তাঁরা ছিলেন অবহেলার পাত্র। ছিলেন লাঞ্ছিতের মতো। লোকেরা বিষহরি, বাশুলি, মঙ্গলচণ্ডী এই সবের পুজো নিয়েই থাকতো। কৃষ্ণ নামে কারও আস্থা ছিল না। যারা কৃষ্ণ নাম করতো, তাদের সকলে উপহাস করতো।

শুধু বিদ্যা ও বিষয় নিয়েই আড়ম্বর। ভক্তির লেশ নেই। বৈষ্ণবরা ম্লান বিমর্ষই থাকেন। চারিদিকেই নিষ্ফলা প্রাণহীন বিদ্যা আর জ্ঞানহীন বিষয়ের ঘটা।

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যজ্ঞ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্যগীত-বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥

তখন শান্তিপুরের, শুধু শান্তিপুরের কেন, নবদ্বীপের, আসে পাশের সমুদয় অঞ্চলেরই সকল লোক বিষয় ভোগে মত্ত।

কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি—যাতে যায় ভবরোগ ॥

ভবরোগ বলি কাকে ? ভোগের ইচ্ছাই হোলো ভবরোগ।

ভোগেচ্ছার নাশ হয় কিসে? ভক্তি আসলে। ভক্তি আসলে প্রসন্ন হন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বাঁধা পড়েন কেবলমাত্র ভক্তিমানের কাছে। কৃষ্ণ ভক্তেরই বশীভূত। ভক্তের দাস তিনি।

অদ্বৈতের গৃহে প্রায়ই বৈষ্ণবদের সভা বসে। তাঁরা সকলে নিজেদের হীন অবস্থা নিয়ে দুঃখ করেন, বিলাপ করেন।

অদ্বৈত হুঙ্কার ছেড়ে বলেন, না, আর দেরী নেই। শ্রীহরি আর্তের ত্রাণ-কর্তা। সর্বমঙ্গলাকর তিনি। তিনি আসবেন। এসে সকলের মঙ্গল করবেন।

এর পরেই সকলে প্রার্থনা শুরু করেন।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

হে গোলোকবিহারী হরি, এসো এসো। অবতীর্ণ হও। কলিজীবের দুঃখমোচন করো। দূর করো জগতের যতেক অন্ধকার, যতেক কলুষ। অভিষিক্ত করো ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর মরুতুল্য শুষ্ক হৃদয় ভক্তির স্নিগ্ধ ধারায়। তুমি এসো।

সঙ্গে সঙ্গেই গর্জন শুরু করেন। তুমি এসো। তোমাকে আসতেই হবে। হে ক্ষীরোদসাগরশায়ী, নিদ্রা থেকে তোমাকে জাগতে হবে। শুধু জাগা নয়। এই ধুলি-মলিন ধরায় তোমাকে অবতীর্ণ হতেই হবে। আমার অন্তরের এই আকুল প্রার্থনাকে উপেক্ষা করতে পারো, হেন সাধ্য তোমার নেই। নেই। তুমি এসো। তোমাকে আসতেই হবে।

অদ্বৈতের হুঙ্কারেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। শুধু কি হুঙ্কার? গর্জন? হুঙ্কার গর্জন আর প্রার্থনা একই সঙ্গে। গর্জন আর ভজন। অদ্বৈত গর্জন করেন আর ভজন করেন। ভজন করেন, তারি মাঝে মাঝে গর্জন করেন। একই সঙ্গে করুণ আকুতি আর 'সিংহের গর্জন'।

হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
সে প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনেই হইল সাক্ষাত॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য॥

এছাড়া, অদ্বৈত প্রতিদিন কৃষ্ণকে তুলসী আর গঙ্গাজলেও আহ্বান করেন। এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল আর একপত্র তুলসী।

তুলসী-মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা-কুতূহলে॥
গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥

তুলসীদল মাত্রেণ, জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেইজন;
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন—
'জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্য ধন'।
তারে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।

যিনি প্রতিদিন কৃষ্ণকে গঙ্গাজল আর তুলসী দেন, কৃষ্ণ তাঁর ঋণ শোধ করতে পারেন না। হেন সাধ্য তাঁর নেই। তাই কৃষ্ণ বাঁধা পড়েন তাঁর কাছে। স্বতন্ত্র হয়েও তাই কৃষ্ণ ভক্তাধীন। তাইতো 'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার'।

মাধবেন্দ্রের আশীর্বাদ-ধন্য অদ্বৈতের মনের জোরও কি কম ছিল? তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাবেন-ই।

শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন-গোচর।

সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারিভুজ চক্র লমু হাতে॥
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমুঁ স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞিঁ তাঁর দাস॥

কী দুর্দমনীয় মনের বল! কী অসীম তেজ!

মাঝে মাঝে বৈষ্ণব ভক্তগণ নিরাশ হ'য়ে পড়েন।

কৈ, এখনও তো এলেন না! তবে কি তিনি আসবেন না?

অদ্বৈত সবাইকে আশ্বাস দেন।

স্থির হও। নিশ্চিন্ত থাকো।

করাইমু কৃষ্ণ সর্বনয়নগোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
আর দিন কথো গিয়া থাক ভাই সব।
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব॥

নবদ্বীপেই উদয় হলেন নবদ্বীপচন্দ্র। সে ১৪০৭ শকের (১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) ফাল্গুনী-পূর্ণিমার দিন। তখন চন্দ্রগ্রহণ। নবদ্বীপের সর্বত্রই হরিধ্বনি। রমণীকণ্ঠে হুলুরব। অসংখ্য শাঁখ বাজলো। কাঁসর ঘণ্টা বাজলো। স্তবস্তুতি ধ্বনিত হ'তে লাগলো।

নদীয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ তমো হইল নাশ ত্রিজগতে উল্লাস
জগৎ ভরি হরিধ্বনি হয়॥

হরি বোল, হরি বোল। হরি বোল, হরি বোল।......

শান্তিপুরেও গঙ্গাতীরে তখন অসংখ্য লোকের ভীড়। হাজারো কণ্ঠে হুলুধ্বনি। হাজারো কণ্ঠে হরি বোল, হরি বোল।......

অদ্বৈত প্রভু প্রতিদিনকার মতো সেদিনও হুঙ্কার করছিলেন। এসো, এসো।

শ্রীহরিদাস রয়েছেন নাড়ার (শ্রীঅদ্বৈতের) পাশে। হঠাৎ অদ্বৈতের এ কী উল্লাস! এ কী নৃত্য!

অকস্মাৎ উঠে নাড়া করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস সচকিত দেখি ভঙ্গী তার॥
আনিলুঁ আনিলুঁ গোরা আনিলুঁ নদীয়া।
ইহা বলি নৃত্য করে আনন্দে মাতিয়া॥

নাচো, প্রভু, নাচো। আজ তুমি না নাচলে নাচবে কে? তুমি নাচবে না? নাচো।

যার লাগি করিলা বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইল প্রকাশ॥

নাচো, প্রভু, নাচো।

অদ্বৈত প্রভু বাহান্ন বছর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্ম দেখতে নবদ্বীপে সূতিকা গৃহে এলেন।

প্রভু, করুণাসুন্দর, তুমি এসেছো! সত্যই এসেছো! এসেছো দ্বৈতাদ্বৈত অবস্থায়। একই দেহে তোমার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। তোমার নবনীরদ-শ্যাম তনুর বাইরে যেন একখানি সোনার প্রতিমা— একখানি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ঝলমল করছে। তোমাকে প্রণাম! কোটি কোটি প্রণাম!

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের মঙ্গলকারী, জগতের কল্যাণস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করি, বারবার প্রণাম করি।

——

মদনমোহন ও শ্রীসনাতন গোস্বামী

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল থেকে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে কিছু সম্ভ্রান্ত লোক গৌড়ে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন রূপেশ্বর দেব। মুকুন্দ এই বংশেরই একজন।

মুকুন্দদেবের পুত্র কুমারদেব। কুমারদেবের তিন পুত্র—অমর, সন্তোষ ও বল্লভ।

অমর ও সন্তোষ গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের অধীনে কাজ করতেন। অমর ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, অর্থাৎ দবীর খাস। সন্তোষ ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, অর্থাৎ সাকর মল্লিক।

উত্তরকালে অমর খ্যাত হলেন সনাতন গোস্বামী নামে। সন্তোষ রূপ গোস্বামী নামে। এই দুই ভাই ছিলেন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সমাজের শিরোমণি।

বাল্যকালে অমর ও সন্তোষ নবদ্বীপে গিয়ে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে অধ্যয়ন করেন। বাসুদেব নীলাচলে চলে গেলে এই দুই ভাই অধ্যয়ন করলেন বাসুদেবের ভাই রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির কাছে।

এর পরে অমর ও সন্তোষ সপ্তগ্রামে গিয়ে ফার্সী ও আরবী শিখলেন।

এঁদের বাড়ী ছিল গৌড়ের ঠিক পাশে রামকেলিতে। এঁরা ধনে, প্রতিপত্তিতে আর খ্যাতিতে এই অঞ্চলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

অমর ও সন্তোষ দুই ভাই-ই সুদক্ষ রাজকর্মচারী ছিলেন। ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তা সত্ত্বেও এঁরা ধর্মময় জীবন যাপন করতেন। অন্তরে ছিল দৈন্যময়, ত্যাগময় বৈষ্ণবীয় জীবন। যৌবন থেকেই বৈষ্ণবীয় সাধনার জন্যে এঁরা ছিলেন উন্মুখ। রামকেলিতে অবস্থান কালেও এঁরা

বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥

ধীরে ধীরে এই দুই ভাই-এর জাগতে লাগলো আর্তি। স্ফুরিত হ'তে লাগলো কৃষ্ণপ্রেম।

বিষয় আর ভালো লাগে না। রাজসম্মান ভার বোধ হয়। সব সময়েই এক চিন্তা, কি ক'রে এই বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার পাবো? কবে থেকে দীনাতিদীন অকপট বৈষ্ণবের জীবন যাপন করতে পারবো?

শ্রীচৈতন্য তখন নীলাচলে। তাঁর জীবনের বহু কথাই এঁরা জানেন। অলক্ষিতে না দেখেই শ্রীচৈতন্যের প্রতি দুই ভাই আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লেন।

একদিন অমর একখানি পত্র লিখে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের কাছে লোক পাঠালেন।

প্রভু, জানি, তুমি জীব উদ্ধারের জন্যেই আবির্ভূত হয়েছো। আমরা বিষয়কীট। ম্লেচ্ছাচারী, পতিত। আমাদের মুক্তির উপায় করো। কৃপা ক'রে উদ্ধার করো আমাদের। আর, অনুমতি করো, তোমার চরণতলে নিজেদের উৎসর্গ ক'রে এজন্ম সার্থক করি।

এই পত্রের জবাব দিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপণ্ডিত বিদ্যারণ্যের সুবিখ্যাত একটি শ্লোকে। পত্রে আর কিছু লেখা ছিল না।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত র্নবসঙ্গ রসায়নম্॥

পরপুরুষে আসক্তা নারী যেমন গৃহকাজে ব্যস্ত থেকেও প্রেমিকের মূর্তি সর্বক্ষণ হৃদয়ে ধ'রে রাখে, ঠিক তেমনই বিষয়ে লিপ্ত থেকেও চিত্তকে ডুবিয়ে রাখা যায় তাঁর প্রেমরসে।

অমর বুঝলেন, এখনও বিষয় ত্যাগ করবার সময় আসেনি।

দিন যায়।

একদিন সদলবলে শ্রীচৈতন্য এলেন রামকেলি। যাবেন বৃন্দাবনে।

অর্ধরাত্রে ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে অমর ও সন্তোষ, দুই ভাই, এলেন প্রভুর আবাসে। এসে জানালেন, তাঁরা মহাপ্রভুর দর্শনপ্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গেই অনুমতি মিললো।

দুই ভাই দন্তে তৃণ ধারণ করলেন। গলবস্ত্র হলেন। কৃষ্ণপ্রেম-রসে নিমগ্ন হ'য়ে মহাপ্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। কাঁদতে লাগলেন।

আমরা নীচ সঙ্গী। নীচ কাজ করি। আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন এই প্রার্থনা জানাতেও, প্রভু, আমরা পরম লজ্জিত হচ্ছি।

নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

আমার সমান পাপী, আমার সমান অপরাধী আর কেউ নেই। ওগো পুরুষোত্তম, কী আর বলবো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, এমন প্রার্থনা করতেও আমার লজ্জা করছে। প্রভু, আমাদের মত অধম, পতিত জগতে আর কেউ নেই। একমাত্র ভরসা, তুমি আছ। আমাদের উদ্ধার ক'রে তোমার বল দেখাও, প্রভু।

আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিত পাবন নাম—তবে সে সফল॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥

প্রভু, যদি দয়ার যোগ্য পাত্র বলে কেউ থাকে, তবে সে আমরাই। কবে হবো তোমার নিত্যকিঙ্কর, শ্রীচরণের দাস? একমাত্র তোমার সেবা ভিন্ন আর সব বাসনা কবে আমাদের বিলুপ্ত হবে, প্রভু?

কান্না থামে না।

মহাপ্রভু বললেন, ওঠো, দৈন্য সংবরণ করো। তোমাদের এত দৈন্য আমি সইতে পারছিনে। বুক ফেটে যাচ্ছে। ভগবানে

নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্টতাই তোমাদের বিষয়াসক্তি কাটিয়ে দেবে। ভয় নেই। ঘরে যাও।

মহাপ্রভু দুই ভাই-এর নাম রাখলেন সনাতন ও রূপ। অমরের নাম রাখলেন সনাতন, সন্তোষের রূপ।

এখন থেকে এই দুই নামেই এঁরা সর্বত্র অভিহিত, অভিনন্দিত হতে লাগলেন।

মহা-আশ্বস্ত হলেন দুই ভাই। গৃহে ফিরলেন। যাবার আগে মহাপ্রভুকে সনাতন একটি গুহ্য কথা জানিয়ে দিলেন।

যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এই নহে পরিপাটি।

মহাপ্রভুর সঙ্গে কাতারে কাতারে লোক বৃন্দাবনে চলছিল।

তিনি সনাতনের এই কথায় সায় দিলেন। বৃন্দাবনে না গিয়ে ফিরে এলেন নীলাচলে।

রামকেলিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাথে সাক্ষাতের পর থেকেই সনাতন ও রূপ আর এক রকমের হ'য়ে গেলেন। রাজকাজে ও বিষয়-কাজে আর মন বসে না। চাকরীতে আর আদৌ স্পৃহা নেই।

কিছু দিনের মধ্যেই রূপ কাজে ইস্তফা দিয়ে চ'লে গেলেন।

সনাতন অসুখের ছল করলেন।

সুলতান চিকিৎসার জন্যে বৈদ্য পাঠালেন।

বৈদ্য ফিরে এসে জানালেন, সনাতন সুস্থই আছেন।

সুলতান সনাতনকে বার বার অনুরোধ করলেন রাজকার্য করবার জন্যে। তিনি বুঝেছিলেন, সনাতন ছাড়া, রাজকার্য চালানো একরকম অসম্ভবই।

সনাতন সুলতানকে বললেন, আমায় অব্যাহতি দিন, জাঁহাপনা। বিষয়কাজে আর কিছুতেই মন বসতে চাইছে না।

কিছুতেই যখন সনাতনকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না, ক্রুদ্ধ হ'য়ে সুলতান তখন সনাতনকে কারাগারে প্রেরণ করলেন।

এদিকে রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে জানালেন, আমি আর ভাই বল্লভ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করতে বৃন্দাবনে চলেছি। তুমি যেমন ক'রে পারো চলে এসো। 'তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহা হৈতে'। মুদির কাছে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছি। প্রয়োজন হ'লে তা-ই উৎকোচ দিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে এসো।

সনাতন কাবাবক্ষীকে সাত হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। রাতারাতি গঙ্গা পার হ'য়ে ছদ্মবেশে নির্জন পথে চললেন। চললেন দীনহীন কাঙালের মতো। হাঁটতে হাঁটতেই এলেন কাশী। কাশীতে এসে শুনলেন, মহাপ্রভু এখানেই আছেন। আছেন চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে।

মহাপ্রভু টের পেলেন, সনাতন এসেছেন। লোক পাঠালেন তাঁকে আনতে।

সনাতন এলেন। এসেই

দুই গোছা তৃণ করে, এক গোছা দন্তে ধ'রে,
পড়িল গৌরাঙ্গ-রাঙা পায়।

মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন।

সনাতন কেঁদে উঠলেন।

আমাকে তুমি স্পর্শ কোরো না। আমি পতিত। আমি অধম। আমি তোমার স্পর্শেরও অযোগ্য।

কী যে বলো, সনাতন! নিজে পবিত্র হবার লোভেই তো তোমায় স্পর্শ করেছি। ভক্তি বলে তুমি যে সারা বিশ্ব পবিত্র করতে পারো।

প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হৈতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

সনাতন নীরবে কাঁদতেই লাগলেন।

মহাপ্রভু হেসে বললেন, কৃষ্ণ তোমায় এতদিনে উদ্ধার করলেন, সনাতন।

সনাতন বললেন, প্রভু, আমি কৃষ্ণ জানিনে। জানি শুধু তোমাকেই। আমি জানি, তুমি-ই আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছো।

কাশীতে কয়েকদিন থেকে মহাপ্রভু সনাতনকে ভক্তিতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, সাধনভক্তির কথা, এইসব শোনালেন। প্রেমের লক্ষণ, ভক্তের লক্ষণ, এ সবও ব্যাখ্যা করলেন। বৈষ্ণব সাধ্য সাধনতত্ত্বও বোঝালেন। তারপর সনাতনের মাথায় হাত রাখলেন।

তোমাকে যা শেখালাম, তোমাতে তা' স্ফুরিত হোক।

তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরে করে।
বর দিনু এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥

এইভাবে সনাতনে শক্তি সঞ্চার করলেন মহাপ্রভু। সনাতনকে নিজ প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় সাধনায় অনুপ্রাণিত করলেন।

সনাতনকে মহাপ্রভু নির্দেশ দিলেন—

তুমিও করিহ ভক্তিরসের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি স্মৃতিশাস্ত্র করি করহ প্রচার ॥

মহাপ্রভু আরও বললেন, সনাতন, এর পর থেকে আমার কান্থা কড়ঙ্গধারী কাঙাল বৈষ্ণবেরা দলে দলে বৃন্দাবনে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তুমি তাদের সবার উপর দৃষ্টি রেখো। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আসিবে তার করিহ পালন ॥

মহাপ্রভু-প্রদত্ত গুরুভার শিরোধার্য ক'রে সনাতন এলেন বৃন্দাবনে। আশ্রয় নিলেন যমুনা পুলিনের আদিত্যটিলায়।

চারিদিকে ঘন সবুজ গাছপালা। এখানে ওখানে অরণ্য। অদূরে যমুনা। একেবারে নির্জন এই অঞ্চল।

সনাতন স্থির করলেন, এ-ই ভালো। এই-ই সাধন-ভজনের উপযুক্ত স্থান। এখানেই থাকবো।

দারুণ কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন চলে।

প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস ॥
বৃক্ষতলে বসি সদা গ্রন্থানুশীলন।
অলক্ষ্যে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন ॥

সনাতন সাধন-ভজন করেন। মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে ঝুলি কাঁধে মথুরায় গিয়ে সামান্য কিছু ভিক্ষা ক'রে নিয়ে আসেন।

এই সময়ে মহাপ্রভুর নির্দেশ মতো লুপ্ততীর্থ উদ্ধারেও তিনি ব্রতী হন।

এই ভাবে কেটে গেল প্রায় এক বৎসর।

সনাতনের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্যে। একদিন বেরিয়ে পড়লেন ঝুলি কাঁধে নিয়ে।

নীলাচলে থাকলেন কয়েক মাস। এখানেও মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হ'তে ভক্তি সাধনার বহু নির্দেশ, বহু উপদেশ তিনি লাভ করলেন।

আবার ফিরে এলেন সনাতন বৃন্দাবনে। আবার সেই আদিত্য টিলায়। শুরু হোলো ভজন কীর্তন।

বৃন্দাবনের আশেপাশে লোকজন ছিল না বললেই হয়। তাই পূর্বের মতো ভিক্ষা সংগ্রহ করতে মাঝে মাঝে সনাতন মথুরায় যেতেন।

সেদিনও সনাতন মাধুকরী করতে গিয়েছেন মথুরায়। উপস্থিত হয়েছেন দামোদর চৌবে নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে।

অঙ্গনে সবে প্রবেশ করেছেন, এমন সময়ে তাঁর নয়নগোচর হলেন শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ।

নিমেষে সনাতনের মনোহরণ করলেন মদনগোপাল।

কী মনোমোহন রূপ! কী নয়নাভিরাম বঙ্কিম ঠাম!

সনাতন স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। পা সরে না। চোখের পলক পড়ে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে প্রেমাবেশে সনাতন বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে।

সনাতনের প্রবল বাসনা জাগলো, আহা, যদি পেতাম এই ঠাকুরকে, সেবা করতাম! সেবা ক'রে ধন্য হতাম!

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করলেন সনাতন।

সনাতন দীন কাঙাল এক বৈষ্ণব। কান্থা করঙ্গধারী। শ্রীবিগ্রহের সেবা করবার সামর্থ্য তাঁর নেই, তিনি জানেন। তবুও আর্তি জাগে।—যদি পেতাম! আহা!

পরক্ষণেই চিন্তা হয়, চৌবে-পরিবার এ বিগ্রহ ছাড়বেন-ই বা কেন?

মাধুকরী শেষে সনাতন বৃন্দাবনে ফিরে আসবেন। বারবার তাকাতে লাগলেন বিগ্রহের দিকে। বিগ্রহ তাঁর মন সম্পূর্ণ কেড়ে নিয়েছেন।

সারা পথ বিগ্রহ-রূপ মনের চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে সনাতন ফিরে এলেন আদিত্যটিলায়।

ধ্যানে বসলেন। এ কী বিপদ! যখনই চোখ বুজে বসেন ভজন আসনে তখনই মদনগোপাল তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়ান, হরণ করেন মনঃপ্রাণ।

শান্তি নেই। স্বস্তি নেই।

আহা! যদি মদনগোপালকে পেতাম! এখানে এনে তাঁর সেবা পূজা করতাম!

দিনের সর্বক্ষণই মদনগোপাল থাকেন চোখের সামনে। রাতেও তাই। ঘুম নেই। সারারাত দেখেন মদনগোপালকে।

এভাবে দেখে কি সাধ মেটে? দেখতে হবে দুই চোখ দিয়ে প্রাণ ভ'রে। তাঁকে ছুঁতে হবে, ধরতে হবে। তাঁর সেবা করতে হবে।

যাই। দেখে আসি।

ছুটে এলেন মথুরায় চৌবে-ভবনে।

প্রায়-ই এমন হয়। যাতায়াত ঘন ঘন হ'তে লাগলো।

ধীরে ধীরে চৌবে-পরিবারের সঙ্গে সনাতনের জন্মালো ঘনিষ্ঠতা।

চৌবে-গৃহিণী শ্রীমতী বল্লভা দেবী মদনগোপালের সেবা করেন। সনাতন মুগ্ধচোখে দাঁড়িয়ে দেখেন।

চৌবে-গৃহিণীর সেবার ভাব কী সহজ আর সুন্দর!

তাঁর কাছে মদনগোপাল যেন বাল-গোপাল। যেন নিজেরই এক ছেলে।

চৌবে-গৃহিণীর পুত্রটির নাম সদন।

সদনের মতোই মদনকে সেবা পরিচর্যা করেন চৌবে-গৃহিণী।

সদন চৌবে গৃহিণীর একমাত্র পুত্র।

কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, ছেলে আমার দুটি।

কৈ, আমরা তো জানি, ছেলে তোমার একটি—সদন।—হয়ত কেউ বললো বিস্ময়ে।

কেন, আমার মদনকে দেখনি? মদন?—না না। আমার দুই ছেলে—সদন আর মদন।

স্নেহে অভিষিক্ত করেন দুই পুত্রকেই। নীরবে চোখ যায় বুজে। হাত দুখানি অলক্ষিতে প্রসারিত হয়।

দুই ছেলেকেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন বুঝি!

সনাতন নৈষ্ঠিক ভক্ত। তাঁর কেমন যেন মনে হয়। একটু চিন্তিতও হ'য়ে পড়েন।

নিজের ইষ্টদেব এই মদনগোপাল। তাঁর সেবা পরিচর্যা করছেন

নিজের ছেলের মতোই মাতৃভাবে। কিন্তু তাই ব'লে প্রকৃত সেবাভাব থাকবে না? থাকবে না দেবতার মত ক'রে সেবাভাব, পূজা-অর্চনা? এ কেমনতরো?

একদিন চৌবে-গৃহিণীকে সনাতন সব কথা খুলেই বললেন।

ত্থাখ মা, তুমি পরম স্নেহে, মাতৃভাবে মদনগোপালের সেবা ক'রে চলেছো। এ ভালো কথাই। কিন্তু কি জানি কেন, আমার মনে হয়, সেবায় যেন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

আপনি খুলে বলুন, গোঁসাই। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।

মা, তুমি মাতৃভাবে, যশোমতীভাবে মদনগোপালের সেবা ক'রে চলেছো। কিন্তু একটা কথা কি জান মা, যশোমতীর বাৎসল্য রস তো সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সঞ্চারিত হওয়া সহজ কথা নয়। তাই বলি—

তবে কি করতে বলেন, গোঁসাই?

বলি, তুমি প্রভু মদনগোপালের সেবা করো সত্যিকার শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে। প্রকৃত বৈষ্ণব ঠিক যেভাবে তাঁর ঠাকুরের সেবা করেন, পূজো করেন, সেইভাবেই পূজো অর্চনা করো।

চৌবে-গৃহিণী বললেন, তাইতো গোঁসাই, আপনি যে আমায় মহাচিন্তায় ফেললেন। আচ্ছা দেখি, আপনার নির্দেশ মতোই ঠাকুরকে সেবা ক'রে দেখি। আজ থেকে বৈষ্ণব শাস্ত্র মতোই তাঁর সেবা অর্চনা করি।

সনাতন চ'লে এলেন।

দিন যায়।

একদিন মদনগোপালকে দেখতে সনাতন মথুরায় গিয়েছেন। কালবিলম্ব না ক'রে তিনি গেলেন চৌবে-ভবনে।

সনাতন বিগ্রহ দেখে ভূমে লুটিয়ে প্রণিপাত করলেন।

চৌবে-গৃহিণী সনাতনকে দেখেই ছুটে এলেন।

না, ঠাকুর। আপনার নির্দেশমতো মদনগোপালের সেবাপূজা

করতে পারলাম না। চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, আমার মদনগোপাল বড়ই ক্ষুন্ন হ'য়ে পড়েছে। তার মুখ গিয়েছে ভার হ'য়ে। সেদিন আমায় স্বপ্নে স্পষ্টই ব'লে দিয়েছে, তুমি ছিলে আমার মা, আমি ছিলাম তোমার পুত্র। সে তো বেশ ছিল। এখন ঠাকুর মনে ক'রে কেন দূরে সরিয়ে রাখছো আমায়? কেন করছো পূজা অর্চনা? এ আমার একটুও ভাল লাগছে না।—একথা স্পষ্ট বলে দিলাম। তোমার দুই ছেলে—সদন আর মদন। এ দুই-এর মধ্যে তারতম্য করলে আমি দুঃখই পাবো।

চমকে উঠলেন সনাতন।

হ্যাঁ, তাই তো। তাই তো। সহজাত প্রেম আর স্বাভাবিক প্রাণের টান—এই-ই তো ঠাকুর সেবার সব চেয়ে শুদ্ধ উপচার। স্বপ্নে চৌবে-গৃহিণীকে এই কথা জানিয়ে প্রভু মদনগোপাল আমারই ভুল ভেঙ্গে দিলেন।

মা, কথা ফিরিয়ে নিলাম। তোমার কথাই ঠিক। তুমি যা ক'রে চলছিলে তাই-ই কর।

দুই চোখে জল এলো।

সজল চোখে সনাতন ফিরে এলেন বৃন্দাবনে।

কিছুদিন গেলো।

মদনগোপালের টান এর মধ্যে আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছে। সনাতনের চোখের সামনে অহরহ বিরাজ করেন মদনগোপাল।

প্রভু, আমি আর তোমার বিরহ সইতে পারছি নে। তুমি এসো। এসো এই দীন কাঙালের কাছে। তুমি না এলে আমি বাঁচবো না। প্রভু, তুমি এসো। এসো আমার কাছে।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥

শ্রীগোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষকাল এক যুগ বলে মনে

হচ্ছে। নয়নে বর্ষার ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। নিখিলভুবন শূন্য বলে বোধ হচ্ছে।

ওগো, তুমি এসো। এসো আমার কাছে।

এদিকে আর এক রঙ্গ।

সদন আর মদন, উভয়ে নিত্য এমন আচরণ করে, যেন এরা দুজনে সহোদর ভাই। কখনও মারামারি, কখনও খেলাধূলা, কখনো বা একসঙ্গে বেড়ানো। আবার কখনও বা একসঙ্গে একই থালায় খাওয়া। সে এক রঙ্গই বটে।

চৌবে পুত্র সহ ঠাকুরের মহাসখ্য হয়।
কভু মারামারি কভু নালিশ করয় ॥
একত্র খাওয়া দাওয়া একত্র শয়ন।
দুঁহে মিলে একত্র করয়ে ভ্রমণ ॥

এইভাবেই দিন কাটতে লাগলো মথুরায় চৌবে-ভবনে।

কিন্তু বৃন্দাবনে সনাতনের অবস্থা? সে বড়ই করুণ।

মদনগোপাল জোর টানে আকর্ষণ ক'রে চলেছেন সনাতনকে। সনাতন আর থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন মথুরায়। ছুটে এলেন চৌবে-ভবনে।

মদনগোপালকে দর্শন করতে গিয়েছেন। গিয়ে দেখলেন এক অলৌকিক ব্যাপার।

মদন আর সদন এক সঙ্গে ব'সে এক থালায় খাচ্ছে।

চৌবের বালকসহ মদনমোহন।
একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন ॥

সনাতন এদৃশ্য দেখে মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

ছুটে এলেন চৌবে-গৃহিণী।

সনাতনের সম্বিৎ ফিরে এলে চৌবে-গৃহিণী ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, গোঁসাই, কি হয়েছে?

দুই চোখে অশ্রুর দুরন্ত প্রবাহ। কাঁদতে কাঁদতেই সনাতন বললেন,

মা, আমার এক নিবেদন আছে তোমার কাছে।

বলুন, গোঁসাই, বলুন।

আজ আমি তোমার গৃহেই মাধুকরী করবো।

এ-তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা, গোঁসাই।

ছাখ মা,

তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ।
যাহা থাকে তাহা দেও, করি কৃপালেশ॥

মা, তোমার পুত্র সদনের পাত্রে যা উচ্ছিষ্ট প'ড়ে আছে, তা-ই আমাকে দয়া ক'রে দাও। আমি তা-ই গ্রহণ করবো।

চৌবে-গৃহিণী শিউরে উঠলেন।

এ কী সর্বনেশে কথা, গোঁসাই! এ কী নিষ্ঠুর কথা!

না না। এ সর্বনেশে কথা নয়। নিষ্ঠুর কথা নয়।

এ ভাগ্যের কথা। অপার ভাগ্যের কথা। আমি দেখেছি মা, প্রভু মদনগোপাল আর তোমার পুত্র সদন একসঙ্গে একই থালায় অন্ন গ্রহণ করছে। এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তোমার ভাগ্যের সীমা নেই, মা।

চৌবে-গৃহিণী নিমেষেই সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন। তাঁর দুই চোখ দিয়ে ধারায় ধারায় জল গড়াতে লাগলো।

জ্ঞান ফিরে এলে অসীম আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে সনাতনকে উচ্ছিষ্ট খেতে দিলেন।

সনাতন সেই উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করা মাত্র প্রেমে জ্ঞানহারা হ'য়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সম্বিৎ ফিরে এলে সনাতন চৌবে-গৃহিণীকে বললেন, মা, মা, আমি আবার বলছি, তুমিই ঠিক। আমিই ভুল বলেছি। সব-ই ভুল বলেছি। তুমি-ই মদনগোপালকে যথার্থ সেবা ক'রে চলেছো।

চলে এলেন বৃন্দাবনে। দুই চোখে তখনও জলধারা।

সেই রাতে সনাতন স্বপ্ন দেখলেন। মদনগোপাল তাঁকে বলছেন, সনাতন, তুমি আমাকে চৌবে-ভবন থেকে নিয়ে এসো। আমি তোমার কাছেই থাকবো। ত্বরিতে নিয়ে এসো।

ওহে সনাতন, চৌবের বাড়ী আছি আমি।
আমারে আনিয়া যত্নে সেবা কর তুমি॥

প্রভু আমার কাছে থাকবেন। নিজেই জানিয়েছেন এই কথা। আনন্দে কেঁদে উঠলেন সনাতন। সে কান্না থামে না।

পরদিন ভোর হতে না হতেই সনাতন রওনা হলেন মথুরার দিকে। ঝটিতি এলেন চৌবে-ভবনে।

মদনগোপালকে দর্শন ক'রে ভুমে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রভু! আমার প্রভু!

কিন্তু অদূরে চৌবে-গৃহিণী কেন ম্লান মুখে বসে রয়েছেন?

সনাতনকে দেখে চৌবে-গৃহিণী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

গোঁসাই, আজ থেকে আমার মদনগোপালের সেবার ভার তুমিই নাও। আমার মদন এখন বড় হয়েছে। সে আর আমার আঁচলের আঁড়ালে থাকতে রাজী নয়। তোমার কাছে যাবে বলে সে বায়না ধরেছে। স্পষ্টই বলে দিয়েছে, 'সনাতনে দেহ মোরে সমর্পণ করি'। তা ছাড়া,—টানা দীর্ঘশ্বাস বেরুলো নাক দিয়ে মুখ দিয়ে—তা ছাড়া, আরও এক কথা। আমাদের সাংসারিক অবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়েছে। ঠাকুরকে আর কষ্ট দিতে চাইনে।—আবার দীর্ঘশ্বাস বেরুলো। সঙ্গে সঙ্গেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

টিয়া পক্ষী যথা প্রতিপালন করয়।
শিকল কাটিয়া পাখী উড়িয়া পলায়॥
শ্রীমতী যশোদা প্রাণপণেতে পালিলা।
ক্ষণ মাত্র বুকে শেল হানি পলাইলা॥

যার যে স্বভাব হয়, তাহা কোথা যাবে।
যায় যাউক আমার, তাহাতে কিবা হবে ॥

নাও, গোঁসাই, আজই তুমি আমার মদনগোপালকে নিয়ে যাও। আমার মদন সুখী হোক। সুখে থাক সে।

এই কথা বলেই

উচ্চস্বরে কান্দে মাতা ভুমে গড়ি যায়।
যশোদা মাতার দশা যথা পূর্বে হয়।

ওরে, ওরে, আমার মদন! ওরে, ওরে, আমার গোপাল!···

সনাতন খুসী হলেন। আকাঙ্ক্ষিত ধন মিলেছে। বুকের নিধিকে বুকে ক'রে সনাতন এলেন বৃন্দাবনে। সেখানে স্থাপন করলেন মদনগোপালকে।

সে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঘমাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে।

মদনগোপাল এলেন।

এলেন সনাতনের কাছে বৃন্দাবনে। কিন্তু এঁর সেবা পরিচর্যা কেমন ক'রে চলবে?

আগে এতটা ভাবেন নি সনাতন। মদনগোপালকে পাবার চিন্তাই তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল। তার পরের চিন্তাটা এতদিন করেন নি।

কিন্তু আজ যে করতেই হবে। ভাবনায় পড়লেন তিনি। ভেবেচিন্তে ভজন-কুটিরের পাশে একটা ঝুপড়ি বাঁধলেন। সেই ঝুপড়ির মধ্যে স্থাপন করলেন প্রাণপ্রিয় ঠাকুরকে—মদনগোপালকে।

ঠাকুর, কী আর করবে! এসেছো যখন এই কাঙালের কাছে তখন কাঙালের মতোই থাকো। থাকো এই ঝুপড়িতে।

এক চোখে অশ্রু। অন্য চোখে হাসি।

নোতুন উৎসাহ নিয়ে মাধুকরী করেন সনাতন। মদনগোপাল আছেন। তাঁর সেবা পূজা করতে হবে।

ভিক্ষা ক'রে সামান্য যা আটা পেতেন, তাই 'দলা' ক'রে আগুনে পুড়িয়ে নিতেন সনাতন। প্রেম ও ভক্তির সঙ্গে তাই-ই নিবেদন করেন ঠাকুরকে। আগুনে পোড়ানো এই আটার 'দলা' প্রচারিত হোলো বৈষ্ণব সমাজে আঙাকড়ি ভোগ নামে। সেই দিন থেকে এখনও এই আঙাকড়ি ভোগ দেওয়া অব্যাহত রয়েছে। লক্ষপতি ধনকুবেররা বহুবার এখানে এসেছেন। তাঁরা দান করেছেন প্রচুর অর্থ, ব্যবস্থা করেছেন রাজকীয় ভোগের! তবুও এই আঙাকড়ি ভোগ দেওয়া এখনও চলছে। এর সঙ্গে আর একটি ভোগও নিবেদন করতেন সনাতন। আদিত্যটিলার আশে পাশে নানা জাতীয় বুনো শাক দেখা যেতো। রোজ তাই তুলে এনে সিদ্ধ ক'রে ভোগ দিতেন। কোনও দিন সৈন্ধব জুটতো, কোনও দিন জুটতো না। যেদিন সৈন্ধব জুটতো না, দীন কাঙাল ভক্ত সনাতন সেদিন আলুনি শাকই নিবেদন ক'রে দিতেন মদনগোপালকে।

কেটে গেলো কিছু কাল।

মদনগোপাল এর মধ্যে বেশ গোল বাধিয়ে বসলেন।

একদিন সনাতনকে স্বপ্নে জানালেন, সনাতন, আমাকে আলুনি শাক খাইয়ে আর কতদিন রাখবে?

> মদনমোহন কহে লবণ বিহনে।
> খাইতে না পারি মোর না রুচে বদনে॥

সত্যিই তো! আমার মদনগোপাল আলুনি খেতে পারেন?

সেদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে কিছু লবণ জুটলো। সেদিন শাক আর আলুনি হোলো না। হোলো না আরও কয়েকদিন।

আবার বায়না! মদনগোপাল

> পুন কহে রুখ আঙা খাইতে নারিল।

এ কী বলছো ঠাকুর!

> তেঁহো কহে ঘৃত শর্করা কোথা পাব।
> বিষয়ীর স্থানে মুঞি মাঙ্গিতে নারিব॥

ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ।
আমা হৈতে নাহি হবে চাহ করি লহ॥

কেঁদে ফেললেন সনাতন।

আমি তো কোনও বিষয়ীর ঘরে ভিক্ষা মেগে তোমাকে চর্ব্যচুষ্য খাওয়াতে পারবো না, ঠাকুর। তুমি তো জানতেই আমি দীন কাঙাল। কিছুই নেই আমার। তা জেনেই তো তুমি আমার কাছে এসেছো। প্রভু, তুমি রাজরাজেশ্বর। রাজভোগ ছাড়া, তোমার তুষ্টি হবে না, তাতো তুমি জানো। কিন্তু এ কাঙাল সে রাজভোগ কোথায় পাবে, বলো? সম্বল আমার শুধু নয়নজল। সেই নয়নজলেই তোমাকে নিত্য স্নান করাই। লেশমাত্র ভক্তি যেটুকু আছে, সেই ভক্তি-চন্দনেই তোমাকে চর্চিত করি। 'পুণ্যবিহীন দীন পণ্যে' তোমায় যে প্রাণের নৈবেদ্য সাজিয়ে চলেছি, তাতেই তোমাকে তৃপ্ত থাকতে হবে, প্রভু! আমার এই ভিক্ষার অন্নে যদি তৃপ্তি নাই-ই পাও, তবে আর কী বলবো, প্রভু, তুমি তোমার নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নাও। আমি যে এর বেশী আর কিছুই পারিনে।

সনাতন কাঁদতেই লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে, ভাবতে ভাবতে সমাধিস্থ হ য়ে পড়লেন।

সম্বিৎ ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরে।

লীলাময়, তুমি কী লীলাই না খেলে চলেছো। ছিলে চৌবে-ভবনে। সেখানে তো ভালোই ছিলে। সুখেই ছিলে। এত ভালবাসা, এত স্নেহ ছেড়ে চলে এলে এই দীন কাঙালের কাছে। অট্টালিকা ছেড়ে এখানে এসে রইলে ঝুপড়িতে। এর পর আবার বায়না ধরলে, এ খাবার মুখে রোচে না। দুদিন বাদে হয়ত ব'লে বসবে, এ ঝুপড়িতে তিষ্ঠোতে পারছিনে। প্রভু, বলো, তুমি বলো, আমি এখন কী করি?

সনাতনের চোখের জল বাধা মানে না।

প্রভু খেতে পারছেন না! প্রভু খেতে পারছেন না!

দিনের পর দিন যায়। সনাতনের চিন্তা বেড়েই চলে।

প্রভুর খেতে ভালো লাগছে না। প্রভু খেতে পারছেন না।

সনাতনের বড়ই মনঃকষ্ট। দুচোখ দিয়ে সর্বদাই জল ঝরে।

অন্তর্যামী মদনগোপাল শুনলেন সনাতনের অন্তরের কথা।

পঞ্জাবের এক বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী কয়েকখানা নৌকো-বোঝাই প্রচুর বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যমুনা দিয়ে চলেছেন। নাম তাঁর লালা রামদাস কাপুর।

হঠাৎ আদিত্যটিলার পাশে সূর্যঘাটের কাছে আসতেই নৌকোগুলো চড়ায় ঠেকে কাৎ হ'য়ে পড়লো। যায় বুঝি নৌকোগুলো ডুবে! সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যসামগ্রী!

মাঝি মাল্লারা প্রাণপণ চেষ্টা করলো সোজা করতে নৌকোগুলো। পারলো না। মহাভাবনায় পড়লেন রামদাস।

কেঁদে ফেললেন। যায় বুঝি যথাসর্বস্ব! হায় হায়!

মধ্যরাত্রি। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই।

অকস্মাৎ নজরে পড়লো দূরে আলো। পাহাড়ের উপর এক কুটিরে মিটিমিটি আলো জ্বলছে।

রামদাস জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নদী সাঁতরে এলেন এপারে। আলো লক্ষ্য ক'রে এলেন আদিত্যটিলায়।

দেখলেন, ধ্যানে নিমগ্ন দেবকান্তি এক মহাপুরুষকে। কী সৌম্য মূর্তি! কী দিব্য বিভা!

মহাপুরুষের সামনে রয়েছেন অপূর্ব সুন্দর এক দেব-বিগ্রহ। শ্রীবিগ্রহ যেন হাসিমুখে চেয়ে রয়েছেন ভক্তের মুখের দিকে।

চকিতে রামদাসের মনে উদয় হোলো, এই মহাত্মার শরণাপন্ন হই। বিপদ হ'তে ত্রাণ পাবোই।

শেষ হোলো সন্ধ্যাবন্দনা। মহাপুরুষ চাইলেন ফিরে।

রামদাস লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদতলে। জানালেন সব কথা। আকুল প্রাণের করুণ আর্তি।

আপনি আমায় বাঁচান। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

মহাপুরুষ বড়ই ব্যথিত হলেন। তাঁর করুণা হোলো।

তিনি ঠাকুরকে দেখিয়ে বললেন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হ'লে আপনার অভীষ্ট লাভ অবশ্যই হবে।

রামদাস সঙ্কল্প করলেন, যদি এ বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পারি, তবে এবারকার লাভের সব টাকা এই মন্দিরের ও মন্দির-দেবতার কাজে উৎসর্গ করবো।

আশ্বস্ত হ'য়ে রামদাস চ'লে এলেন নদীতীরে। দেখলেন, ইতিমধ্যেই নৌকোগুলো সোজা হয়েছে।

রামদাস নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাণিজ্য ক'রে এলেন। চতুর্গুণ লাভ হোলো সে বার।

সঙ্কল্পমতো সমুদয় লাভের টাকা নিয়ে তিনি এলেন সেই মহাপুরুষের কাছে।

সে মহাপুরুষ আর কেউ নন—শ্রীপাদ সনাতন। আর, সেই ঠাকুর মদনগোপাল।

সেই অর্থ দিয়ে নির্মিত হোলো সুরম্য মন্দির। জগমোহন, নাটশালা। কেনা হোলো ঠাকুর সেবার জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি। সেবা ও ভোগ বিতরণের স্থায়ী ব্যবস্থা হোলো।

রামদাস আর তাঁর স্ত্রী সনাতনের কাছে দীক্ষা নিলেন।

এখন থেকে মদনগোপাল আবার মদনমোহন নামে পরিচিত হলেন।

উত্তরকালে মদনমোহন স্থানান্তরিত হয়েছিলেন জয়পুরে। সে অবশ্য আর এক কাহিনী।

ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা হোলো।

দূর হোলো সব চিন্তা।

সনাতন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু চোখে জল আসে যে।

প্রভু, আগে ছিলে চৌবে-ভবনে। এলে সনাতনের ঝুপড়িতে। এবার এসে দাঁড়ালে সারা ব্রজমণ্ডলের তীর্থরাজ রূপে। জীবের কল্যাণে এই যে লীলা দেখিয়ে চলেছো, কৃপাময়, তা যুগ যুগ ধ'রে প্রকট থাকুক। এ লীলায় ছেদ টেনো না, লীলাসুন্দর!

তাকালেন মদনমোহনের দিকে। তাঁকে দেখেই কেঁদে ফেললেন সনাতন।

এবার আমায় মুক্তি দাও। তুমি তো জানো, প্রভু, এই বিরাট মন্দিরে আমি থাকতে পারবো না। আমার বাসস্থান ঝুপড়ি, গাছের তলা। সে-ই আমার সুখের, সে-ই আমার শান্তির জায়গা। আমি সেখানেই যাই। তুমি আমায় মুক্তি দাও, প্রভু।

ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে সনাতন ঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

নবনির্মিত এই বিরাট মন্দিরে সনাতন একদিনও বাস করলেন না। তিনি গোবর্ধনের পাদমূলে, রাধাকুণ্ডের তীরে, গোকুলের অরণ্যে ঝুপড়ি বেঁধে বাস করতে লাগলেন। 'প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।'

দিন যায়।

হঠাৎ একদিন কাশী থেকে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন সনাতনের কাছে।

তাঁর নাম জীবন ঠাকুর। নিবাস মানকরে—বর্ধমানে।

দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে চিরজীবন নিষ্পেষিত হয়েছেন। এখন বৃদ্ধ। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার আর শক্তি নেই। তাই বিশ্বনাথের চরণে একদিন আকুল আকুতি জানালেন।

প্রভু, আমায় দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দাও। মুক্তি দাও।

রাত্রে জীবন ঠাকুর স্বপ্ন দেখলেন।

বিশ্বনাথ তাঁকে বলছেন, বৎস, তুমি বৃন্দাবনে যাও। সেখানে সনাতন গোস্বামী আছেন। তাঁর শরণাপন্ন হও। তিনি কৃপা করলেই তোমার দারিদ্র্য চিরতরে দূর হবে।

বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঞির স্থান।
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আন॥

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে, ঠাকুর এলেন বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে। জানালেন সব কথা। বিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশও জানালেন।

সনাতন এ সব কথা শুনে বিস্মিত হলেন।

এ কী অভাবনীয় কাণ্ড! আমি একজন নিষ্কিঞ্চন ভিক্ষুক। দীনাতিদীন কাঙাল। আমি কি ক'রে এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দূর করতে পারবো? অথচ স্বয়ং বিশ্বনাথের প্রত্যাদেশ! এ-ও তো মিথ্যা হ'তে পারে না। তবে? মহাভাবনায় পড়লেন সনাতন।

অনেক ভাবনার পরে সনাতনের মনে পড়লো এক ঘটনা।

যমুনার তট বেয়ে তিনি চলেছেন একদিন। আপন মনে ভজন করতে করতেই চলেছেন। হঠাৎ তাঁর পায়ে লাগলো এক দুর্লভ রত্ন। এ কী! এ যে পরশ পাথর!

তিনি বৈষ্ণব। এ পরশ পাথর দিয়ে তিনি কি করবেন? যমুনায় নিক্ষেপ করবেন? তা কেন? যদি ভবিষ্যতে আর কোনও লোকের উপকার হয়, এই ভেবে পরশ পাথরখানি বালির নীচে পুঁতে রেখে আবার ভজন করতে করতেই ফিরে এলেন সনাতন।

এতদিন ভুলেই গিয়েছিলেন এই কথা। এতক্ষণে মনে পড়ছে।

তিনি ব্রাহ্মণকে জানালেন, আপনি পরশ পাথরখানি নিয়ে যান। এ থেকে আপনার দারিদ্র্য দূর হবে।

ঠাকুর তখুনি ছুটলেন।

নির্দিষ্ট স্থানে বালির নীচে পেলেন পরশ পাথর।

হঠাৎ আনন্দে ঠাকুর আত্মহারা হলেন।

হয়েছে, হয়েছে। দারিদ্র্য দূর করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

জয় বাবা বিশ্বনাথ!

কিন্তু, কিন্তু, এই মহাপুরুষের তো এর জন্যে একটুও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে নি। জাগে নি তো লেশমাত্র লোভ! এই মহাত্মা এমন কী ধন পেয়েছেন যার তুলনায় এই ধন, এই পরশ পাথর, তাঁর কাছে কিছুই নয়! একেবারেই অকিঞ্চিৎকর!

ভাবতে ভাবতে এলেন সনাতনের কাছে। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন

যে ধনে হইয়া ধনী মনিরে মানোনা মনি,
তাহারই খানিক
মাগি আমি নতশিরে। এত বলি নদীজলে
ফেলিল মানিক।

ব্রাহ্মণ পরশ পাথরখানি যমুনায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সনাতন গোস্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গ করলেন। দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছে।

এই জীবন ঠাকুরের বংশ উত্তরকালে কাঠমাগুরার গোস্বামী বংশ বলে পরিচিত হয়।

জীবনের শেষ দিকে সনাতন নন্দীশ্বরের মানসগঙ্গা নামে পুণ্য সরোবরের তীরে বাস করতে থাকেন। এই জাগয়া বৈঠান নামে খ্যাত হয়।

সনাতন এই বৈঠানে থেকে চরম কৃচ্ছ্রসাধনায় রত হলেন। দিনরাতের ভেদাভেদ রইলো না। রইলো না আহার নিদ্রার ভাবনা। দিবানিশি শুধু ভজন। শুধু ধ্যান।

তিনি দিনরাত রাধাকৃষ্ণের আরাধনা নিয়েই থাকেন।

কত দিনে অন্তর্মনা, ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম গানে সদা থাকে
অবসর নাহি এক তিলে॥

সনাতনের বয়স এখন নব্বই। দেহ জরাতুর।

প্রাণপ্রিয় ভক্ত সনাতনের এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখে ইষ্টদেব মদনমোহন গোপবালকের বেশে তাঁর কাছে এলেন। এলেন এক দিন নয়। দিনের পর দিন। সনাতনের দৈনন্দিন আহার্যের ভার নিলেন।

কৃষ্ণ গোপবালকের বেশে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে, হর্ষ হৈয়া॥
গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়।
দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি, গোস্বামীরে কয়॥
আছহ নির্জনে, তোমা কেহ নাহি জানে।
দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে॥
এই দুগ্ধ পান কর, আমার কথায়।
লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিও এথায়॥
কুটিরে রহিলে, মো সভার সুখ হবে।
ঐছে রহ, নহিলে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে॥

মদনমোহন ও সনাতনের এই প্রেমলীলার কথা অচিরে চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়লো। দলে দলে তাঁর ভক্ত, অনুগামীরা ছুটে এলেন। পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সকলের অনুরোধে সনাতন কৃচ্ছ্রসাধনের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস করলেন। ব্রজবাসীরা বৃক্ষতলে একখানি কুটির বেঁধে দিলেন। সনাতন সেই কুটিরে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করলেন।

গিরি গোবর্ধন পরিক্রমা ছিল সনাতনের জীবনের এক প্রধান ব্রত।

গোবর্ধন বৈঠান থেকে বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম তিনি এখান থেকেই পরিক্রমা করতেন। শেষে অশক্ত হ'য়ে পড়লেন।

তিনি এখন অত্যন্ত জরাতুর। স্থবির। চলাচলে অশক্ত।

বড়ই দুঃখিত হ'লেন সনাতন। বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়লেন।

গোবর্ধন পরিক্রমা করতে পারবো না। হায় প্রভু!

অপূর্ব মনোহর রূপ ধারণ ক'রে একদিন গিরিধারীজী এলেন সনাতনের সম্মুখে। হাতে তাঁর এক শিলাখণ্ড।

গিরিধারীজী বললেন,

সনাতন, তুমি বড়ই ব্যথা পাচ্ছ আমার গোবর্ধন পরিক্রমা করতে পারছো না ব'লে। তাই আমি ছুটে এলাম তোমার কাছে। এই ছাখো, আমার হাতে গোবর্ধনেরই এক শিলাখণ্ড। চেয়ে ছাখ, এই শিলাখণ্ডে আমার চরণচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। আজ হ'তে এই চরণ-পাহাড়ী* ভক্তির সঙ্গে প্রত্যহ পরিক্রমা করবে। তাতেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এই চরণ-পাহাড়ী পরিক্রমা করলে তোমার পরিশ্রমের লাঘব হবে। আমারও আনন্দ হবে।

অশ্রু-সজল চোখে সনাতন চরণ-পাহাড়ী গ্রহণ করলেন। প্রণাম করতে গিয়ে সম্বিৎ হারালেন।

এইদিন থেকে সনাতন এই চরণ-পাহাড়ী পরিক্রমা করতেন প্রতিদিন।

এই চরণ-পাহাড়ীকে কেন্দ্র ক'রে সনাতনের ভজন ও তপস্যা চলতে লাগলো।

এই চরণ-পাহাড়ী দেখতে একটা বট পাতার মতো। গৌড়ীয় ভক্তরা একে গোবর্ধনের প্রতীক ব'লে এখনও মনে করেন। এতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে।

সনাতনের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীজীব গোস্বামী চরণ-পাহাড়ী নিয়ে গিয়ে নিজের ইষ্টদেব রাধাদামোদরজীর মন্দিরে স্থাপন করেন।

এখনও চরণ-পাহাড়ী সেখানে রয়েছে।

ক্রমে এলো ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমা। চরণ-পাহাড়ীর পুণ্যময় বেদীতে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরই ইষ্টদেব। দাঁড়িয়েছেন রাধাশ্যামের যুগলরূপে। সনাতনকে দর্শন দিলেন।

দৃষ্টি ফেরে না। পলক পড়ে না। সনাতন দেখতেই লাগলেন। মরি-মরি!

কিন্তু চোখের জল এত শত্রুতাও করে!

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দেখতে দেখতে সনাতন প্রবিষ্ট হলেন শাশ্বত লীলাধামে।

নিমেষে সারা ব্রজমণ্ডল যেন ভেঙ্গে পড়লো। সবাই ছুটে এলেন সনাতনের কুটিরে। দূর-দূরান্ত থেকেও অসংখ্য অনুগামী ভক্তজন মর্মান্তিক এই সংবাদ পেয়ে সেখানে এলেন ছুটে।

এ-তো শোক অনুষ্ঠান নয়! এ যেন এক মহা-মহোৎসব!

অসীম শ্রদ্ধাভরে সনাতনের দেবদেহ ভস্মীভূত করা হোলো। যথোচিত মর্যাদা ও আড়ম্বরের সঙ্গেই সেই চিতাভস্মের কিয়দংশ বৃন্দাবন-ধামে এনে মদনমোহনজীর মন্দির প্রাঙ্গণে করা হোলো সমাহিত।

আজও অগণিত পুণ্যকামী লোক এখানে এসে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ক'রে থাকেন।

এখনও প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন মন্দিরে শ্রীপাদ সনাতম গোস্বামীর তিরোধান মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত ভক্ত সমবেত হ'য়ে সনাতনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে পরমশ্রদ্ধায় জানান প্রণতি।

——

তারা মা ও বামাক্ষ্যাপা

তারা মায়ের মন্দির।

তারাপীঠের তারা মা।

মন্দিরের খ্যাতি দেশজোড়া। দূর-দূরান্ত থেকেও লোকেরা আসেন মা-কে দর্শন করতে। মায়ের পূজা দিতে।

মা বড়ই জাগ্রতা। সকলের অন্তরের আকুতি মা শোনেন। সকলেরই অভীষ্ট লাভ হয়। এখানে এলে মন শান্ত হয়।

তারাপীঠের তারা মা।

মন্দিরের প্রধান কৌলপদে যিনি, তিনি কেমন যেন।—পাগল পাগল ভাব। পরণে কাপড় প্রায়ই থাকে না। মুক্ত দিগম্বর পুরুষ। যদৃচ্ছা আহার! একসঙ্গে বসে একপাতে ইনি যাচ্ছেন আর কুকুর খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরের উচ্ছিষ্টও খেয়ে চলেছেন এই পরম নির্বিকার পুরুষ। কোনও দিকেই হুঁশ নেই যেন। অনেকে বলেন, ইনি নাকি প্রায়ই ভাবোন্মত্ত অবস্থায় থাকেন। বহুলোক এঁকে বলেন ভৈরব। বহুলোক বলেন ক্ষ্যাপা বাবা।

দেশ দেশান্তর থেকে অগণিত লোক মন্দির-দেবতা তারা মা-কে দর্শন করতে এলে ক্ষ্যাপা বাবাকেও দর্শন করেন। তারা মা-কে প্রণাম নিবেদন ক'রে ক্ষ্যাপা বাবাকেও প্রণাম করেন।

একদিন এই ক্ষ্যাপা বাবা এক ভয়ানক কাণ্ড ক'রে বসলেন। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তারা মায়ের গায়ে মূত্রত্যাগ ক'রে ফেললেন।

পুরোহিত আর পাণ্ডারা উঠলেন হায় হায় ক'রে।

এ কী হোলো! কী সর্বনাশ!

কেউ কেউ ক্ষ্যাপা বাবাকে গালি দিতে লাগলো। কেউ-বা গেলো মারতে।

ক্ষ্যাপা বাবা একটুও দমলেন না। ভয় পেলেন না।

বেশ করেছি। আমার মা-র গায়ে আমি মুতেছি। তোদের কিরে শালারা?

কী অকপট অথচ দৃপ্ত কথা!

চম্‌কে উঠলেন অনেকে।—ওরে ব্‌বাবা!

কে এই তেজীয়ান দুর্ধর্ষ পুরুষ? নির্ভীক সাধু?

কে তারা মায়ের এই ছোট্ট ছেলে? আদরের দুলাল?

না না। এ মায়ে পোয়ের ঘরোয়া ব্যাপার। কাজ নেই এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোয়।

তা কেন? এ-যে একেবারে স্পষ্ট কথা। খাঁটি কথা। নির্ভেজাল কথা!

এমন ধারা কথা যিনি বলতে পারেন, এমন ধরণের দুঃসাহসিক কাজ যিনি করতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু না বুঝলেও তাঁকে প্রণাম করি।

প্রণাম, বাবা, প্রণাম।

কে এই ক্ষ্যাপা বাবা?

এই তারাপীঠই বা কোথায়?

তারাপীঠের কথা, তারা মায়ের প্রিয় ক্ষ্যাপা বাবার কথা শুনতে ইচ্ছে করে। বলতে ইচ্ছে করে।

এই ক্ষ্যাপা বাবা আর কেউ নন—বামাক্ষ্যাপা।

মহাভক্ত বামাচরণ। মহাবরিষ্ঠ তান্ত্রিক সাধক বামাচরণ।

আর, তারাপীঠ?

তারাপীঠ রামপুরহাটের কাছে, বেশী দূরে নয়। রামপুরহাট বীরভূম জেলায়।

বীরভূম জেলা।

বৈষ্ণবসাধনা ও তন্ত্রসাধনা—এ দুই-ই এখানে চলেছে সমান তালে, সমান প্রবাহে। চলেছে যুগ যুগ ধ'রে।

বৈষ্ণব সাধক জয়দেব, চণ্ডীদাস, প্রভু নিত্যানন্দ—এঁরা এই জেলাতেই জন্মেছেন।

বহু উচ্চকোটির সিদ্ধ কৌলেরা আবির্ভূত হয়েছেন এই জেলায়। এঁরা তপস্যা করেছেন, সিদ্ধিলাভ করেছেন জেলায় বিভিন্ন পীঠস্থানে থেকে। একান্ন শক্তিপীঠের পাঁচটিই বীরভূম জেলায়। সিদ্ধপীঠ, উপপীঠও আছে এই অঞ্চলে বহু।

রামপুরহাট এই জেলারই একটি মহকুমা শহর। এরই সামান্য কিছু দূরে তারাপুর। দ্বারকা নদী তারাপুরের পাশ দিয়ে ব'য়ে চলেছে। এই তারাপুরে একটি পীঠস্থান আছে। নাম তারাপীঠ।

না, এটি একান্ন শক্তিপীঠের একটি নয়। এ একটি তন্ত্রসম্মত সিদ্ধপীঠ। এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন মহাবরিষ্ঠ তান্ত্রিক মহর্ষি বশিষ্ঠ।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী-তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতা ॥

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। এই হোলো দশমহাবিদ্যা। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা তারাদেবী।

সারা ভারতে তারাদেবীর সিদ্ধপীঠ আটটি। তারাপীঠ এই আটটির মধ্যে একটি।

মহর্ষি বশিষ্ঠ তারা-সিদ্ধ হ'য়ে দেবীর শিলাময়ী প্রতীক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারাপুরে। এখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডীর আসনও স্থাপন করেছিলেন।

মহর্ষির আবির্ভাব—সে-তো কতকাল আগেকার ঘটনা। তারপর

থেকে বহু শক্তিসাধক এসেছেন এখানে!—এই তারাপীঠে। এঁদের তন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ হয়েছে, আলোকিত হয়েছে। অধ্যাত্ম-প্রতিভা এখানে সমুজ্জ্বল হ'য়ে বিকশিত হয়েছে। তাইতো তন্ত্রসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ব'লে যুগ যুগ ধ'রে এই তারাপীঠ কীর্তিত হ'য়ে আসছে।

তারা মায়ের মন্দির। শিব মন্দির এর পাশেই অবস্থিত। এখানকার শিব পরিচিত চন্দ্রচূড় নামে।

মন্দির-চত্বরের প্রান্তে বিস্তীর্ণ বালুকাতট। এখানেই মহাশ্মশান। দ্বারকা নদী অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন ক'রে আছে এই শ্মশান ক্ষেত্র।

লোকের বিশ্বাস, এই শ্মশানে মৃতের দেহ অস্থি পড়লে মুক্তি তার অবধারিত। তাইতো দূর দূরান্ত থেকেও লোকে এখানে মৃতদেহ নিয়ে আসে সৎকারের জন্যে। ফলে, চিতার আগুন আর নিভবার অবসর পায় না। এ মহাশ্মশানের প্রথা হোলো, শবকে আধপোড়া ক'রে রাখতে হবে। সেটা টেনে নেবে শেয়ালে, কুকুরে, শকুনে। টানা-হেঁচড়া ক'রে তারা শব-মাংস খাবে। আধপোড়া শব হাড়গোড়, মাথার খুলি যেখানে সেখানে প'ড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে পচিত শব থেকে দুর্গন্ধ ভেসে আসে। সেখানে তখন টেকাই দুঃসাধ্য।

শ্মশানের পাশেই শিমুলতলায় বশিষ্ঠদেবের পঞ্চমুণ্ডীর আসন। কাছেই জীবিত কুণ্ড—একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী।

এই হোলো এখানকার পরিমণ্ডল।

এই অঞ্চল নিয়ে কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে!

রত্নাগড়ের প্রসিদ্ধ বণিক জয়দত্ত।

নানা দ্রব্যে নৌকো বোঝাই ক'রে তিনি দ্বারকা নদী বেয়ে বাণিজ্য করতে যেতেন।

জয়দত্ত সঙ্কল্প করলেন, নিজের পুত্রকে বাল্যকাল থেকেই তাঁর ব্যবসা শিখোবেন।

একবার বালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে জয়দত্ত দ্বারকা নদী বেয়ে চলেছেন। সঙ্গে নানাজাতীয় প্রচুর বাণিজ্যসম্ভার। এই মহাশ্মশানের একপাশে তিনি নৌকোগুলিকে লঙ্গর ক'রে রাত্রি কাটাবেন মনস্থ করলেন। তাই-ই করলেন।

একখানা নৌকোয় জয়দত্ত ও তাঁর পুত্র বসে হিসাব দেখছিলেন। ঠিক সেই সময়ে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এলো কৃষ্ণবর্ণের এক কুমারী কন্যা। সে শুধালো, তোমাদের নৌকোয় কি আছে গো? জয়দত্ত একমনে হিসাব দেখছিলেন। কথা কানে গেল না। কন্যা আবার জিজ্ঞাসা করলো। তখনও কোনও জবাব নেই। বারবার একই প্রশ্ন করায় জয়দত্ত বিরক্ত হলেন। বললেন, ছাই আছে।

ভোর হোলো। কী সর্বনাশ! সবিস্ময়ে জয়দত্ত দেখলেন, তাঁর সমস্ত নৌকোয় আর কিছুই নেই। শুধু ছাই। শুধু কি তাই? তাঁর একমাত্র পুত্রটি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল কয়েক দণ্ডের মধ্যেই।

শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন জয়দত্ত। এমন সময়ে তাঁর ভৃত্য এসে স্বচক্ষে দেখা একটি অলৌকিক ঘটনার কথা তাঁকে জানালো। ত্বরিতে জয়দত্ত চলে এলেন ভৃত্যকে নিয়ে পুষ্করিণীর ধারে। অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, পুষ্করিণীর জলে মৃত খণ্ডিত শোল মাছ তাঁরই সম্মুখে বেঁচে উঠলো! কৌতূহলী হ'য়ে ভৃত্যকে তক্ষুনি সেখানে নিয়ে আসতে বললেন তাঁর মৃতপুত্রকে।

ভৃত্য মৃতদেহ আনলো। প্রভুর নির্দেশমতো নিক্ষেপ করলো ঐ পুষ্করিণীর জলে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃতপুত্র বেঁচে উঠলো।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! ফিরে পাওয়া পুত্রকে দেখে জয়দত্ত যত আনন্দ পেলেন, বিস্মিত হলেন তার চেয়েও অধিক। তিনি পুষ্করিণীর নাম রাখলেন জীবিতকুণ্ড।

ঠিক সেই রাত্রেই জয়দত্ত স্বপ্ন দেখলেন, তারা দেবী কুমারী কন্যা সেজে তাঁর সামনে এলেন। তাঁকে শোনালেন তারাপীঠের মাহাত্ম্য।

জয়দত্ত কৃতার্থ হলেন।

অচিরে জয়দত্ত জীবিত কুণ্ডের সন্নিহিত জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করলেন। সংস্কার করবার সময়ে তিনি এর মধ্যে অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের দর্শন পেলেন। তারা মূর্তিও তাঁর নয়নগোচর হোলো।

জয়দত্ত বৈষ্ণব। তাঁর সাধ হোলো এখানে নারায়ণ শিলারও প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দিনেই একজন মহাত্মার নিকট থেকে তিনি নির্দেশ পেলেন, এখানে তারা মূর্তিতেই নারায়ণের পূজো চলবে। কালী ও কৃষ্ণের সমন্বয়েই সাধক এই মূর্তি গড়েছেন। তিনি উপদেশ দিলেন, কালী ও কৃষ্ণ এই দুইকে পৃথকভাবে ভেবো না। এ দুই পৃথক কিছুই নয়। কালীই কৃষ্ণ হন। আবার, কৃষ্ণই কালীমূর্তি ধারণ করেন। সাধকের ইচ্ছাতেই এ-সব ঘটে। ভক্তিভাবে তাঁকে যা সাজানো যায়, তিনি তাই সাজেন। ভাবের ঘরে কোনও মূর্তিভেদ নেই। না, এতে দুঃখের কিছুই নেই। কালী ও কৃষ্ণ এক।

সন্তুষ্ট হলেন জয়দত্ত। তিনি তারাদেবী ও চন্দ্রচূড় মহাদেবের পূজোর ব্যবস্থা করলেন।

তারাপীঠের পাশেই আটলা গ্রাম। নদীর অপর পারে।

এই গ্রামে বাস করেন সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তারা মন্ত্রে দীক্ষিত সরল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পৌরোহিত্য করেন। সামান্য জমিজমা আছে—তাও দেখাশোনা করেন।

সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র বামাচরণ।

জন্ম এঁর ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন। এ আর বেশী দিনের কথা কি!

ছেলেবয়স থেকেই বামা আপন-ভোলা। একেবারে উদাসীন প্রকৃতির। তবে বড্ডই সরল। এত সরল যে গাঁয়ের সাধারণ লোকে

বামাকে বলে হাউড়ে। অর্থাৎ কিনা, যার বুদ্ধি নেই, বোকা। হ্যাঁ, তাইত। যার নেই সাংসারিক বুদ্ধি এক রত্তি, তাকে হাউড়ে ছাড়া আজকাল আর কি বলবে! তা বলুক।

বাড়ীর পাশে এক খড়ের গাদা ছিল বামার খেলবার জায়গা। সেই খড়ের গাদার উপর বামা প্রায়ই একলা বসে থাকতো। একদিন খড়ের গাদায় লাগলো আগুন। পাশের লোকেরা তা দেখতে পেয়ে ছুটে এলো। অবাক হ'য়ে তারা দেখলো, তখনও বামা খড়ের গাদার উপর পরম নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে। একেবারে নির্লিপ্তভাবে। রয়েছে যেন সে আর এক জগতে।

বামাচরণ পাঠশালায় ভর্ত্তি হবে। গেল পাঠশালায়।

গুরুমশাই বললেন, খোকা, লিখতে জানো?

হ্যাঁ, জানি।

লেখো তো।

বামা শ্লেটে লিখলো। সারা শ্লেটেই লিখলো, তারা তারা।

গুরুমশাই বললেন, এ কী লিখেছো?

কেন—? বড়-মা'র নাম লিখেছি।

বড় মা?

তারা মা গো, তারা মা। তারা মা-ই আমার বড় মা। আর—

আর? তোমার গর্ভধারিণী?

ছোট মা।

মাঝে মাঝে সর্বানন্দের সংসারে পয়সার টান পড়তো। তখন তিনি কৃষ্ণযাত্রায় দল ক'রে টাকা রোজগার করতেন। বামা সেই দলে কখনো সাজতো কৃষ্ণ, কখনও বা রাম। বাবা বাজাতেন বেহালা। ভালো বেহালা বাজাতেন সর্বানন্দ।

একবার তারা মা-র আঙিনায় রামের বনবাস অভিনয় হচ্ছে। বামা সেজেছেন রাম। রামের অভিনয় করতে গিয়ে বামা গান

গাইছেন। দুচোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ বামার সমাধি হোলো। বামা লুটিয়ে পড়লো। সকলেই ভাবে বিভোর। কি করতে হবে কেউ বুঝতে পারছে না। দুই একজনে বামার মাথায় জল ছিটোতে লাগলো। সর্বানন্দ বেহালা বাজিয়েই চলেছেন।

বামার মা সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। নিলেন কোলে তুলে বামাকে। জয় তারা, জয় তারা বলতে লাগলেন। দেখা দেখি সবাই জয় তারা বলতে লাগলো। জয় তারা। জয় তারা।......

বামার জ্ঞান ফিরে এলো।

বামার বড় বোনের নাম জয়কালী। সবাই ডাকতো ক্ষেপী ব'লে। তিনি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের সাধিকা। অল্প বয়সে বিধবা হলেন। হলেন পরে সন্ন্যাসিনী। যৌবনে তারাপীঠে এসে কিছুকাল কাটালেন। পরে আটলায় এসে থাকলেন বাবার কাছে। একটা নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেহত্যাগ করবেন সঙ্কল্প করেছিলেন। চ'লে এলেন সেই দিনে তারাপীঠে। সারাদিন অবিরাম তারানাম জপ করতে লাগলেন। জপ করতে করতেই তিনি সেই দিনে স্থায়ী আসন পাতলেন তারা মায়ের কোলে। 'আমার দিদি বড় ভালো ছিলেন গো' বলতেন পরে বামাচরণ দিদির কথা উঠলে।

আচ্ছা মা, মাটির ঠাকুর কেন জ্যান্ত হয় না?

কেন বাবা, ঠাকুর সব সময়েই জ্যান্ত। তাঁকে প্রাণভ'রে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন।—মা বলেন।

বামা ছুটে গেলো। তৈরী করলো মাটি দিয়ে কালীমূর্তি। নিয়ে এলো বুনোফুল কচুপাতায় সাজিয়ে। আনলো ডাসা পেয়ারা কয়েকটা।

প্রাণ ভ'রে ডাকতে লাগলো।

ও ঠাকুর, কথা কও। পেয়ারা খাও। বলি শুনছ? কথা কও।

চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো।

কত ডাকাডাকি! কত খোসামোদ!

ঠাকুর কথা কয় না। খায় না।

নে মা, খা' খা'। এখনও খেলি নে?

বামার খাওয়া দাওয়া বন্ধ। মা যে কিছুই খায় না। কথা কয় না। এলো গর্ভধারিণী মা-র কাছে।

কৈ মা, তুমি যে বলেছিলে, প্রাণভ'রে ডাকলে ঠাকুর শোনে। আমার কথা শুনছে না কেন?—মাকে জিজ্ঞাসা করে।

জয়কালী ছিলেন পাশে। তিনি বললেন, আর কিছুদিন পরেই ঠাকুর তোর কথা শুনবে।

বামা দিদির বড় অনুরক্ত। দিদির কথায় আশ্বস্ত হোলো।

বড় হ'লে ঠাকুর আমার কথা শুনবে!

বামার আনন্দ আর ধরে না।

সর্বানন্দ হাসেন।

এ ছেলে আমার সামান্য ছেলে নয় গো। তারা তারা।

বামার ঠাকুর গড়া, ঠাকুর পূজো নিত্য চলতে লাগলো।

সর্বানন্দের প্রতিবেশী দুর্গাদাস সরকার। তিনি নাটোরের রাজ-সরকারে কাজ করতেন। তাঁরই উপর ছিল তারাপীঠের ও তারা মায়ের তত্ত্বাবধানের ভার। তারাপুর মৌজা ছিল নাটোর-রাজের নিজস্ব সম্পত্তি।

খ্যাতনামা তারাসাধক কৈলাসপতি বাবা দুর্গাদাসকে স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে দুর্গাদাসের গৃহে তিনি আসতেন। তিনি আসলেই বামাচরণ গিয়ে কৈলাসপতি বাবার সেবা করতো। তাঁর সঙ্গ করতো। বামা তাঁকে ডাকতো শ্রীগুরু বাবা বলে।

তখন ভর দুপুর বেলা। চৈত্র মাস। রোদে চারদিক খাঁ খাঁ করছে।

বামা, বামা! এসো না এদিকে।

কে ডাকছো আমায় ? তোমায় তো দেখতে পাচ্ছিনে।

এইতো, আমি এখান থেকে কথা কইছি।

পাশেই সুরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ী। তাঁর একখানা ছোট ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ছেলে। কপালে চন্দনের ফোঁটা। খুব সুন্দর দেখতে।

তুমি কোন্ বাড়ীর ছেলে গো ? তোমায় তো কখনও দেখিনি।

আমি কারও ছেলে নই। আমি এই বাড়ীর নারায়ণ।

তাই নাকি ? ভা-রী মজাতো !

ছাখো, এরা আমায় একটুও জল খেতে দেয় না। আমার কষ্ট হয়। তুমি আমায় নিয়ে চল।

তা. এতে আমার দোষ হবে না তো ?

না না। তোমার কোনও দোষ হবে না। কোনও ভয় নেই তোমার।

তা তুমি যে রয়েছো দোতলায়। তোমার কাছে যাবো কি করে ?

একটু রোসো। আমি একখানা কাপড় ঝুলিয়ে দিচ্ছি। তুমি ঐ কাপড় ধ'রে উপরে উঠে এসো। কেমন ?

ছেলেটি কাপড় ঝুলিয়ে দিলো। বামাচরণ কাপড় ধ'রে উপরে উঠলো।

রূপো দিয়ে বাঁধানো একটি শালগ্রাম শিলা।

ছেলেটি সেই শালগ্রাম শিলা দিলো বামাচরণের হাতে।

যাও, এইবার যাও। দেরী কোরো না।

তা, তুমি যাবে না ?

আমি ? আমি পরে যাবো।

শালগ্রাম শিলা নিয়ে ঝুলোনো কাপড় ধরেই বামা নীচে নেমে এলো।

চল ঠাকুর। তোমায় খুব ক'রে গাঙের জল খাওয়াবো। তা হ'লে তোমার আর তেষ্টা থাকবে না।

রোদ ভেঙ্গে বামা এলো নদীতে। শালগ্রামকে চুবিয়ে ধরলো নদীর জলে।

পেট ঠুসে জল খাও।

শ্মশানের পাশে নদীর বালির পরে বসালো শালগ্রামকে। আনলো বুনো ফুল, বেলপাতা। করতে লাগলো পূজো।

ঠাকুর, এই ফুল লে। এই বেলপাতা লে।..........

পূজো হ'য়ে গেল।

এইবার তুমি ঘুমোও। আমি বড়মাকে দেখে আসি।

ঘর বন্ধ। অথচ শালগ্রাম শিলা নেই। সুরেন্দ্র চক্রবর্তী চারদিকে খুঁজতে লাগলেন। এ-তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার। আরও অনেকে খুঁজতে লাগলেন।

একজনে বললেন, বামা নিয়ে যায় নি তো? মনে হচ্ছে এ বামারই কাজ।

তক্ষুনি সুরেন্দ্র চক্রবর্তী এলেন শ্মশানে বামার খোঁজে। সঙ্গে বহু লোক।

লোকজন দেখে ভীত হ'য়ে বামা পালিয়ে এসে রইলো কৈলাসপতি বাবার কাছে।

সকলের হাবভাব দেখে কৈলাসপতি বাবার রাগ হোলো। বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কিজন্যে এসেছ? কি চাও তোমরা?

সুরেন্দ্র চক্রবর্তী সব কথা জানালেন। এ নিশ্চয়ই বামার কাজ। —তিনি বললেন।

কৈলাসপতি বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব সত্যি, বামা?

বামাচরণ সত্যি কথাই বললো। জানালো সব বৃত্তান্ত।

আমার কোনও দোষ নেই শ্রীগুরু বাবা। আজকাল ঠাকুর-গুলোই বদ। আমায় চুরি করতে ব'লে এখন মার খাওয়াবে। আজকাল ঠাকুরগুলোই বদ।

আর কখনও এমন কাজ করিস্ নে।

এই গুরুজ্ঞান (দিব্যি) করছি, শ্রীগুরু বাবা। এই বদ ঠাকুরগুলোর কোনও কথা আর শুনবো না।

সর্বত্রই বদনাম রটলো—বামা ঠাকুর চোর। তা রটুক। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বামার। লজ্জা নেই। ভয় নেই। নির্বিকার।

বামার আঠারো বছর বয়সে সর্বানন্দ মারা গেলেন। অতান্তরে পড়লেন বামার মা। নিরুপায় হ'য়ে বামাকে ক্ষেত-খামারে কাজ করতে পাঠালেন। আপন-ভোলা বামাকে দিয়ে একাজ চলে? ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এলো বামা।

সংসার আর চলে না।

এদিকে বামা হয়েছে পাগলের মতো। কোনও বিষয়ে মন লিপ্ত হ'তে চায় না।

মা বলেন, বাবা, পাগলামি ছাড়্। কোনও কাজ-কর্মের চেষ্টা ছাখ্। এমনি ক'রে আর কদিন চলবে? সত্যি সত্যি কি আমরা না খেয়ে মরবো? কোনও কিছু উপায়ের ব্যবস্থা করতে পারবি নে?

মা-র কথায় নরম হয় বামার মন। তাঁর ইচ্ছা, মা-র আদেশ শিরোধার্য করে। কিন্তু সে তো লেখাপড়া শেখে নি। শেখেনি অন্য কাজ কর্ম। তবে এইটুকু সে স্থির বুঝেছে, তারা মায়ের রাজত্বে কেউ-ই না খেয়ে মরে না। জীব জন্মাবার আগেই মায়ের বুকে দুধ জুগিয়ে দেন কে? তারা মা। তিনি যে দয়াময়ী। তাই তারা মাকে জানালেই চুকে যাবে সব ল্যাঠা।

একদিন বামা তারা মাকে সব জানালো।

আমাদের কি এমনই দিন যাবে? কষ্টের কি শেষ হবে না, মা?

ছোট মার কথাই বড় মাকে জানালো যুগল মায়ের ছেলে বামা। কেঁদে ফেললো সে। চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটল। তারপর ধীরে ধীরে পেলো শান্তি। বামার স্থির বিশ্বাস হোলো, হ্যাঁ, বড় মাকে জানিয়েছি, কিনারা একটা হবেই।

দিন কাটে।

এর মধ্যেই তারা মায়ের পরে বামার টান পড়েছে খুবই। মাঝে মাঝে সে তারা মায়ের পুজো করে। তখন উৎসাহের আর অবধি থাকে না। লেখাপড়া শেখে নি। পড়ে নি শাস্ত্রগ্রন্থ। তাই তার পুজোয় কোনও বিধি বিধানের বালাই নেই। নেই মন্ত্রতন্ত্রের ঘটা। কচুপাতায় চাঁপা, করবী, ঘেঁটু, এইসব ফুল এনে তারা মা-কে নিবেদন করে। কণ্ঠে শুধু তারা তারা। তারা তারা।

ছেলে বয়স থেকেই তার গলার আওয়াজ ছিল গুরুগম্ভীর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই গুরু গম্ভীর আওয়াজই রয়ে গেল। যে শুনেছে তারা তারা ডাক তার কণ্ঠে, সে-ই অবাক হয়েছে। বাপ্ রে, কী আওয়াজ! শুধু কি আওয়াজ? ধ্বনির সঙ্গে মিশেছে আবেগ, ভক্তি আর বিশ্বাস। তাইতো তারা তারা তার কণ্ঠে প্রাণ ভরা প্রাণ-মাতানো ডাক। তারা তারা।

এখন থেকে আপন খেয়ালখুশীমত বামা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বা অতর্কিতে চ'লে আসে তারা মায়ের মন্দিরে। হেঁটে নয়, ছুটে। তারা তারা।

সামনে তারা মা। শিলা আসনে তারা মায়ের পাদপদ্ম অঙ্কিত। সেই পাদপদ্মে বামা ঢেলে দেয় রাশি রাশি বুনো ফুল প্রাণ ভ'রে। তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। চোখ ফেরে না। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ধারায় ধারায়। জলের সে কী তোড়! যেন স্রোতস্বিনী ব'য়ে চলেছে! কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারা তারা।

এইভাবে এই হাউড়ে বামার সাথে তারা মায়ের দিব্য সত্তা জড়িয়ে পড়লো ওতপ্রোত। এইভাবেই সবার অগোচরে, এমন কি নিজের

অগোচরেও, বামা হ'য়ে উঠলো তারাময়। তারা ছাড়া আর কেউ নেই। তারা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বামার কণ্ঠে শুধু তারা তারা।

তারাপীঠের শ্মশানে থাকেন কত উচ্চস্তরের সাধুসন্ত। তাঁরা এক একজন মহাসাধক। এখানকার প্রধান কৌলপদে রয়েছেন মোক্ষদানন্দ। কৈলাসপতি বাবাও থাকেন এখানে। এঁরা দুজনেই মহাতান্ত্রিক মহাত্মা। তারাপীঠে এলেই বামা এই দুই মহাত্মার সঙ্গ করেন।

বামার কণ্ঠে শুধু তারা তারা। হলেন কতকটা যেন পাগলের মতো। লোকেরা বলতে শুরু করলো বামা 'ক্ষ্যাপা' হ'য়ে গিয়েছে। এখন থেকে বামা 'বামাক্ষ্যাপা' নামেই পরিচিত হলেন। অনেকের কাছে শুধু 'ক্ষ্যাপা' নামেই।

বামাচরণ কখনও একান্ত নিভৃতে তারা মায়ের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। সারা রাতই হয়ত কেটে গেলো। সেদিকে খেয়াল নেই। কখনও বা মা-র বিরহে হ'য়ে পড়েন উন্মাদের মতো। চীৎকার শুরু করেন তারা তারা। সে যেন গগনভেদী চীৎকার! যাঁরা অভ্যস্ত নয়, তাঁরা যেন সে ধ্বনি শুনে চমকে ওঠে। যারা চেনে বামাচরণকে, তারা পায় আনন্দ। পায় সান্ত্বনা।—যাক্! শত কাজের মধ্যেও তো তারা নাম কানে এলো। মাঝে মাঝে বামাচরণ তারা মায়ের মন্দিরে গিয়ে তারা মাকে দেখে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন। থাকেন বেহুঁশ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ।

তারা মা-র বিরহে অধীর হ'য়ে একদিন বামাচরণ দ্বারকা নদী সাঁতরে পার হ'য়ে চলে এলেন মন্দিরে।

তারা মাকে দেখে চ'লে এলেন কৈলাসপতি বাবার কাছে। লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে।

বাবা, মার দেখা কি পাবো না? মা কি দেখা দেবেন না একটি বারের জন্যেও? তাঁকে না দেখে যে থাকতে পারছিনে।

কাঁদতে লাগলেন বামাচরণ।

সন্তুষ্ট হলেন কৈলাসপতি বাবা। এযে একেবারে শুদ্ধসত্ত্ব আধার! এ-হেন আধারে মা না এসে পারেন!

অধীর হ'য়ো না, বাবা। অচিরেই তুমি মা-র দেখা পাবে।

এই দিন থেকেই বামাচরণ তারাপীঠের শ্মশানেই র'য়ে গেলেন।

কৈলাসপতি বাবার সান্নিধ্যে এসে বামাচরণের দিন সুখেই কাটতে লাগলো।

কৈলাসপতি বাবার ক্ষমতাও কি কম ছিল? লোকে বলে, খড়ম পায়ে ভরা বর্ষার উন্মত্ত দ্বারকা তিনি হেঁটে পেরিয়ে আসতেন। এ নাকি বহু লোকে স্বচক্ষে দেখেছে। মরা তুলসী গাছকে তিনি এক কথায় বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। সেদিন তিনি সবে ধ্যান হ'তে উঠেছেন। বামা রয়েছেন পাশে। সামনেই রয়েছে একটা মরা তুলসী গাছ। কথায় কথায় এটি দেখালেন বামাকে।

ক্ষ্যাপা, এটি মৃত না জীবিত?

কেন বাবা, এ-তো একেবারে মরা গাছ!

জীবন আর মৃত্যু কিন্তু একই বাবা। তুলসী জীউ, তুলসী জীউ ব'লে বাবা কমণ্ডলু হ'তে জল ঢেলে দিলেন মরা তুলসী গাছের পরে। সঙ্গে সঙ্গেই এই মরা, প্রাণহীন গাছটিতে পাতা জন্মালো। তুলসী গাছটি হ'য়ে উঠলো মুঞ্জরিত। সিদ্ধ তন্ত্রসাধকের মুখনিঃসৃত বাণীর এতই শক্তি! এ-তো বামার স্বচক্ষে দেখা।

সাধক হিসাবে বামার আধার শুদ্ধতম। পরম স্নেহে কৈলাসপতি বাবা বামাকে কৌলমার্গের নিগূঢ় মন্ত্র ও ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে শুরু করলেন বামার শক্তি সাধনা।

এখন থেকে শ্মশানবাসী বামা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তারা মায়ের ধ্যানে।

এদিকে জননীর কত না ভাবনা পাগল ছেলে বামার জন্যে!

একদিন তিনি এলেন কৈলাসপতি বাবার কাছে। পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কেঁদে ফেললেন। জানালেন দুঃখের কথা, অন্তরের কথা।

বাবা জননীকে সান্ত্বনা দিলেন।

তুমি চিন্তা কোরো না। তোমার ছেলের ভার আজ থেকে আমি নিলাম। তবে এও বলি মা—জেনে রাখ। তোমার এই ছেলে সামান্য ছেলে নয়। দেশের হাজার হাজার লোককে এ-মুক্তি দেবে। অগণিত লোকের প্রকৃত কল্যাণ হবে এর মাধ্যমে। ভয় নেই। দুঃখ কোরো না। সংসার বামার জন্যে নয়।

দুর্গাদাস ছিলেন পাশে। শুনলেন অভাব অনটনের কথা। তিনি ভাবলেন, বামাদের সংসারে কিছু পাইয়ে দিতে হবে। বামা তারা মা-র মন্দির ছেড়ে কোথাও যাবে না। তাই তিনি ঠিক করলেন, বামা রোজ দেবীর পূজার ফুল তুলে আনবে। সে জন্যে তাকে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

কিন্তু এ কাজ বামাকে দিয়ে চললো না। দেখা গেল, ফুলের সাজি নিয়ে বামা চলেছেন। চলেছেন যেন বেহুঁশ হ'য়ে। হয়ত প্রহর ধ'রে একটি ফুলের ডালে হাত রেখে দাঁড়িয়েই রয়েছেন। ফুল তোলা আর হয় না। মন্দিরের পূজারীর কি এমন লোককে দিয়ে চলে?

দুর্গাদাস অন্য কাজ দিলেন। চন্দন ঘষা, নৈবেদ্য সাজানো, এই সব।

আপন ভোলা সাধক বামা। এ কাজও তাঁকে দিয়ে চললো না।

দুর্গাদাস বললেন, এখন থেকে বামার কোনও নির্দিষ্ট কাজ আর রইলো না। সে নিজের ইচ্ছামত যা করবে তাই-ই করুক।

তারা মায়ের আদরের দুলাল তারা মায়ের কাছেই র'য়ে গেলেন। মায়ের কাছেই রইলেন মায়ের আঁচলধরা ছেলেটি—বামা।

বামা দিন দিন হ'য়ে উঠলেন চরম বৈরাগী। কিছুমাত্র দৃষ্টি নেই শরীরের দিকে। আহার বিহারও খেয়াল খুশী মত। থাকবার ঘরেরও প্রয়োজন রইলো না। থাকেন মুক্ত আকাশের নীচে। শীত

গ্রীষ্ম বর্ষা আসে যায়। ব'য়ে যায় সমানে দেহের উপর দিয়ে। পরনে কাপড় কখনও থাকে। কখনও বা একেবারে দিগম্বর তিনি।

তারা মা আনন্দময়ী। আনন্দময়ীর আনন্দদুলালকে কে নিরানন্দে রাখবে ?

কৈলাসপতি বাবা ও মোক্ষদানন্দ কাশী যাবেন।

বামার ইচ্ছে হোলো, তিনিও কাশী যাবেন। মা অন্নপূর্ণাকে দেখবেন।

দুজনেই জানেন, বামার কাশী ভালো লাগবে না। তাঁরা নিষেধ করলেন।

বামা নাছোড়বান্দা।

তারা মা-ও নিষেধ করলেন। স্বপ্নে বামাকে জানালেন, আমায় ছেড়ে যাস্‌নে বামা। তোর ওখানে কষ্ট হবে।

না মা বাধা দিও না। বড় ইচ্ছে, একবার মা অন্নপূর্ণাকে দেখে আসি।

মা কিছুতেই যেতে দিতে চান না।

বামা যাবেন-ই।

আচ্ছা, যাবি যা। তোর কিন্তু কষ্ট হবে। তোর ওখানে ভালো লাগবে না।

তুই কাশী গিয়ে কি করবি ?—কৈলাসপতি বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার বড় ইচ্ছে শ্রীগুরুবাবা, একবার অন্নপূর্ণা মা-কে দেখে আসি।

আচ্ছা এখন যা'। যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাবো।

তিন জনে কাশী রওনা হলেন।

রেলগাড়ীতে উঠে গাড়ীর চারদিক দেখে বামা তো অবাক ! শিশুর মতো সরল তিনি। তাই শিশুর মতোই কৌতূহল।

আচ্ছা, শ্রীগুরুবাবা, এই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রথ কে বানিয়েছে ?

এ বিশ্বকর্মা বাবারা বানিয়েছে।

তা হ'লে তো শ্রীগুরুবাবা আমার বিশ্বকর্মা বাবারা ভা-রী ওস্তাদ।

হ্যাঁরে, ক্ষ্যাপা।

গার্ডসাহেবকে দেখে বামা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ঐ সব ধবধবে গবগবে পিরাণ পরা গটমট ক'রে যে কথা কইছে, ওরা কারা ?

মোক্ষদানন্দ বললেন, ওরা সাহেব বাবারা। ওরাই বিশ্বকর্মার জাত।

তা হ'লে তো বেদজ্ঞ বাবা, আমার সাহেব বাবারা খুব বুজরুগ আছে।

স্টেশনের ঘণ্টা বাজলো।

বামা ভাবলেন, এরা সবাই তারা মা-র ভক্ত। ঘণ্টা বাজিয়ে তারা মা-র পুজো করছে।

কৈ শ্রীগুরুবাবা, বুজরুগ সাহেব বাবারা যে ঘণ্টা বাজিয়ে তারা মা-র পুজো করলো· ওরা আমাদের তো একটু পেসাদ দিলে না।

আর তুই বকাস্‌নি। ঘুমো।—ধম্‌কে দিলেন কৈলাসপতি বাবা।

এলেন কাশী।

কত লোকের ভীড় এখানে! কত জায়গার লোক!

বামা একা একা বলেন, ওরে বাবা, কত লোক! এদের গায়ে কী দুর্গন্ধ! আমার পিত্তি শুকিয়ে যাচ্ছে! হেঁঃ—এই বুঝি অন্নপূর্ণা মা-র স্বগ্‌গো রাজ্য! আমার তারা মা-র রাজ্যিই ভালো। সেখানে কেমন আলো বাতাস! কত বড় শ্মশান! এত ভীড় নেই, গোলমাল নেই সেখানে।

তুই এলি কেন ? তোকে তো বারণ করেছিলুম। শ্মশান ছেড়ে এ জায়গা তোর ভালো লাগবে না। দুদিন অপেক্ষা কর। তারা মা-র রাজ্যে দু'দিন পরে যাবি।

রাত্রি অনেক হয়েছে। ওদের তখনও খাওয়া হয় নি।

ছ্যাঃ ছ্যাঃ। এই বুঝি মা অন্নপূর্ণার স্বগ্‌গো রাজ্য! মা অন্নপূর্ণার কত দানের কথা শুনি! তাই তো বাবা, সেই কাল তারা মা-র পেসাদ খেয়েছি, এখনও কেউ পর্যন্ত একটু জল দিলো না! ছ্যাঃ ছ্যাঃ। মা অন্নপূর্ণার বুঝি এই দান! কাজ নেই বাবা আমার বদ কাশীতে। আমার তারা মা-র রাজ্যিই ভালো।

ক্ষিধেয় কাতর হ'য়ে বামা ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে এক বুড়ী এলেন এক ঠোঙা খাবার নিয়ে।

ওঠো।

বামা উঠলেন।

এই মায়ের প্রসাদ রইলো। খাও।

এইবার বামা হেসে ফেললেন। খেতে খেতে বললেন, বেটি বোধ হয় শুনতে পেয়েছে। তুমি মা অন্নপূর্ণাই হও, আর যে-ই হও, তোমার কাশী কিন্তু বদ।

বামা পেট ভ'রে খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

বামা স্বপ্ন দেখলেন।

মা অন্নপূর্ণা তাকে বলছেন, তুই এত নেমকহারাম কেন রে? আমি নিজে গিয়ে তোকে প্রসাদ দিয়ে এলুম। তাতেও আমার কাশীর নিন্দে করিস্।

তুমি মা অন্নপূর্ণাই হও, আর বাবা বিশ্বনাথই হও, তোমার কাশী কিন্তু বদ। কী দুর্গন্ধ! কত লোক! বাপ্‌রে বাপ। আমার প্রাণবায়ু শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার তারা মা-র রাজ্যি কত সুন্দর! কেমন শ্মশান! কেমন আলো বাতাস! কেমন খোলা মেলা!

আমার কাশীর নিন্দে করিস যদি তোর ভালো হবে না। তুই এখান থেকে বিদায় হ'। তোর এখানে জায়গা হবে না।

কাজ নেই আমার স্বগ্‌গো ধামে। চাইনে থাকতে তোমার বদ কাশীতে। আমার তারা মা-র রাজ্যিই ভালো।

পরদিন সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা হোলো বামার। তিনি বামাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

চার দিন বামা কাশীতে রইলেন। তারপর কাউকে কিছু না ব'লে চ'লে এলেন রেলগাড়ীতে। গাড়ী ছেড়ে দিলো।

টিকিট-চেকার টিকিট চাইলেন।

টিকিট নেই।

তবে ভাড়া দাও।

বামা ট্যাক্ খুঁজতে লাগলেন। এদিক ওদিক। আবার ওদিক এদিক। এই ক'রে কাপড় খুলে গেল। টাকা পয়সা যে নেই তা-ও ভুলে গিয়েছেন। চেকার ধমক দিলেন। বামা দিগম্বর অবস্থায় গাড়ী থেকে নেমেই দৌড়! দৌড়!

উনিশ কুড়ি দিন দারুণ কষ্টভোগ ক'রে একরকম অনাহারে থেকে এসে পড়লেন সিউড়ী। বীরভূমের সিউড়ী।

সিউড়ীর কালীবাড়ীতে এক রাত কাটালেন। মা কালীর মূর্তি দেখে বামা ভারী খুসী। ভোর হ'লেই আবার চললেন।

মা চললুম। বড় মা-র জন্যে মন বড় ছটফট করছে।

চলতে চলতে বামা পথ হারিয়ে ফেললেন।

এ কোথায় নিয়ে এলি, মা?

যার কাছেই পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেই-ই বিরক্ত হয়। বামা বড়ই হয়রান হ'য়ে পড়লেন।

এমন সময়ে একটি মেয়ে এলো। শ্যামবর্ণের কুমারী মেয়ে। এত রূপ বামা জীবনে আর দেখেন নি। বামা মেয়েটির দিকে তাকিয়েই রইলেন।

কোথায় যাবে?—মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো।

বামা রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। দুই চোখ দিয়ে জল ঝরছে। কথা বেরুতে চায় না।

তুমি কাঁদছো কেন? পথ হারিয়ে গিয়েছো, তা-ই? তাতে কি হয়েছে? আমি-ই তোমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাবে, তাতো এখনও বললে না।

মেয়েটিকে দেখে বামার সবই যেন গুলিয়ে গিয়েছে।

কোথায় যাবো তাতো জানিনে।

তোমার বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে। তাই মাথাটা একটু গোলমাল হ'য়ে গিয়েছে। তুমি একটু বোসো। আমি মায়ের মন্দির থেকে প্রসাদ নিয়ে আসি।

মেয়েটি চ'লে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো কিছু খাবার নিয়ে।

এই নাও, খাও।

এত ভালো ভালো ফল এমন অসময়ে কি ক'রে পেলে গো?

তারা মা-র রাজ্যে এ সবের অভাব কি, বাছা?

এতক্ষণে বামার মনে পড়েছে।

হ্যাঁ, তারাপীঠ কোন দিকে, বলত?

তারাপীঠে যাবে? সে যে অনেক দূর। তা যাক্। ভেবো না। আমি সোজা পথ দেখিয়ে দেবো।

মেয়েটি বনের মধ্যে দিয়ে সোজা দেখিয়ে দিল। কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গেও এলো।

বামা তারাপীঠে এলেন।

লুটিয়ে পড়লেন তারা মা-র মন্দিরে গিয়ে। তারা তারা।

দিন যায়।

হঠাৎ বামার মা মারা গেলেন।

বামা শ্মশানঘাটে স্নান করতে নেমেছেন। ওখান থেকেই দেখলেন, ওপারে আত্মীয়-স্বজনদের ভীড়। ছোট ভাই রামচরণও রয়েছেন সেখানে। ব্যাপার কি? বামা বুঝলেন, মা-র মৃতদেহ নিয়েই সবাই এসেছেন। বর্ষার দ্বারকা। পার হওয়া সহজ কথা নয়। তাই ওপারেই দাহ করবার আয়োজন চলছে।

মা-র দেহ দাহ হবে না এই মহাশ্মশানে! তাঁর দেহ-অস্থি তারাপীঠের পবিত্র শ্মশানে রাখা হবে না!

মা তারা, দেখিস্, আমার মা যেন তোর এই শ্মশানে ঠাঁই পায়!

তারা তারা!

বামা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রাণের আবেগে নিমেষেই যেন গেলেন ওপারে। মা-র মৃতদেহ কাপড়ে জড়ালেন। উঠোলেন কাঁধে। আবার দিলেন ঝাঁপ! তারা তারা! মা-কে নিয়ে সাঁতরে এলেন এপারে। তারা মায়ের পীঠেই দাহ করা হ'ল বামার মাকে।

হ্যাঁ, এ-ই ঠিক হয়েছে। এইখানে, এই মায়ের আঙিনায় থাকবে আমার মায়ের দেহ। তার একপাশে থাকবে ক্ষেপী দিদি। আর এক পাশে থাকবো আমি।

মা, মাগো, এই মায়ের আঙিনায় তুমি চির-শান্তিতে আমার কাছে কাছেই থাক! মা, মাগো!

মাতৃশ্রাদ্ধ হবে।

ছোট ভাই রামচরণ একেবারে নিঃস্ব। হবিষ্যান্নই জোটে না।

বামা এলেন বাড়ীতে। রামচরণকে আদেশ করলেন, দেখিস্, মা-র শ্রাদ্ধ কিন্তু ফাঁকি দিয়ে করবিনি। চারখানা গাঁয়ের লোককে নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ে দে। তারা তারা!

রামচরণ হাসলেন। দাদা বলে কি! কোথায় টাকা? একটা পয়সারও জোগাড় নেই।

বামা নিজে এসে জায়গা পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন। লোকজন আসবেন। তাঁরা বসবেন। তাঁদের খাবার জায়গাও চাই।

রামচরণ বুঝলেন, দাদা গোঁ ধরেছে। নেমন্তন্ন না করলে রক্ষে থাকবে না।

শ্রাদ্ধের দিন।

বামা ব'সে আছেন শ্মশানে। তারা তারা!

এদিকে ভারে ভারে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আসতে লাগলো। নানা জাতীয় প্রচুর খাদ্যসম্ভারে শ্রাদ্ধ অঙ্গন ভ'রে গেলো।

ইন্দ্রজাল নাকি! ইতিমধ্যে শত শত অতিথিও এসে পড়লেন। বহু লোক নিমন্ত্রিত। তাঁরাও এসেছেন।

হঠাৎ আকাশে দেখা দিলো ঘন কালো মেঘ। চারদিক আঁধার হ'য়ে গেলো। দারুণ বৃষ্টি এলো বুঝি!

রামচরণ কেঁদে ফেললেন। মা-র শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন হবে না!

শ্মশানে তখন বামা ধ্যানে নিমগ্ন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো আকাশে। সেখানে মেঘের ঘনঘটা। ছুটে এলেন বাড়ীতে। তারা তারা!

ছোট ভাই দাদাকে দেখেই কেঁদে ফেললেন।

দাদা, মা-র কাজ হয় না!

ভয় নেই। আমার তারা মা-র প্রসাদে ব্রাহ্মণ ভোজনে কোনও বিঘ্ন হবে না। তুই শান্ত হ। ভাবিস্‌নি। তারা তারা!

অন্য লোকেরাও ভয় পেলেন। কাজ বুঝি পণ্ড হয়! খাওয়া বোধ হয় আর হয় না!

কী! স্বয়ং তারা মা যার মাতৃ শ্রাদ্ধে উপস্থিত, তার আয়োজন পণ্ড হবে! তো শালারা কুঁচকি কণ্ঠা ঠুসে খা। তোদের কোনও ভয় নেই। তারা তারা!

সে কী শব্দ! তারা তারা!

বামা একখানা কঞ্চি কুড়িয়ে নিলেন। সেই কঞ্চিখানা দিয়ে অনাবৃত প্রাঙ্গণ বেষ্টন ক'রে গণ্ডী কেটে আসলেন। তারা তারা!

তার পর জপ করতে লাগলেন তারা নাম। হ'য়ে পড়লেন ধ্যানস্থ।

বহু লোকের সমাবেশ সেখানে। বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে সবাই দেখলেন, আটলা গ্রামের আশে পাশে, এমন কি আটলা গাঁয়ে গণ্ডীর ঠিক বাইরেও, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। শ্রাদ্ধ বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নি! কী আশ্চর্য!

সবাই দেখলেন এই অলৌকিক কাণ্ড! সবাই বুঝলেন, তারা মা-র আদরের ছেলে বামার ডাক শুনেছেন তারা মা।

দিন যায়।

মাঝে মাঝে বামা গান গাইতেন। তাঁর প্রিয় মা-র গান।

ডুব দে না মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখনও,
দু চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে ডুবে যাও,
কুল কুণ্ডলিনীর মূলে ॥

সেদিন বামা তারা মা-র সঙ্গে কথা কইছিলেন।

মা, তুই এমন নিদয়া কেন? ছেলেকে যে মা এত কাঁদায়, তা আমি কোথাও দেখিনি। ধন্যি কিন্তু তুই। তবে বেটি, তুই যতই কেন কষ্ট দে না, বামা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বামাকে ফাঁকি দিতে তুই কিছুতেই পারবিনে।

বামা আবার গান ধরলেন,—

আর কারে ডাকবো শ্যামা?
ছেলে কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,
মা বলবো যাকে তাকে।
মা যদি ছেলেকে মারে,
ছেলে কাঁদে মা মা ক'রে,
ঠেলে দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে
ছাড়ে না মা যত বকে।

আর একদিনের কথা।

সেদিন বামার আর এক ভাব। সেদিন গান গাইছেন, আর হাততালি দিচ্ছেন। সেদিন মুখে কী আনন্দের আভাষ!

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আমি মা তোর সঙ্গে যাবো।
রাঙা পায়ে সোনার নূপুর
বাজবে আমি শুনতে পাবো।

সেদিন কী আনন্দ! যাঁরাই শুনলেন সেদিনকার এই গান বামার মুখে, তাঁরা সবাই খুব আনন্দ পেলেন। বামার আনন্দের ছোঁয়াচ লাগলো সবাকার প্রাণে।

মাঝে মাঝে বামা মন্দিরে গিয়ে মা-র সঙ্গে এমনভাবে কথা কইতেন, সে কথা আর কেউই বুঝতে পারতেন না।

বামা কখনও কাঁদতেন, কখনও হাসতেন। কখনও বা বলতেন, তুই বেটি বড় বদ। এই ব'লে মা-র মুখের দিকে চেয়ে হাসতেন।

বামা হাসলে মনে হোতো যেন মা-ও হাসছেন। বামা কাঁদলে তারা মা-র মুখ ভার হয়েছে ব'লে মনে হোতো। মাঝে মাঝে মন্দিরে গিয়ে বামা তারা মা-র মুখে চড় মেরে বসতেন। লোকে অবাক হ'য়ে যেতো। কেউ বা ভয় পেতো। কী সর্বনাশ!

হয়ত কথা ব'লে চলে আসছেন, হঠাৎ বামার মনে হোলো, মাকে তো এই কথাটা বলা হয়নি, তক্ষুনি ফিরে গিয়ে সেই কথাটা ব'লে ফিরে আসতেন।

একজন ভক্ত এসে বামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন, বাবা?

বসুন, বাবা, বসুন। অমনি এক রকম আছি, বাবা। তারা বেটি বড় বদ। খুব কষ্ট দেয়, বাবা। বেটির পেসাদ সময় সময় বন্ধ করে দেয়। কারণ-টারণ কিছু এনেছো কি? বেশ, বাবা, বেশ। সবাই মিলে খাও। আমার কুকুরকে কিছু দাও। আমাকে কিছু দাও।

বামা গান ধরলেন।

মরবো আর অমনি যাবো ব্রহ্মে মিশাইয়ে,
তারার চরণে মিশাইয়ে।……

এই সময়ে মানুষের ভীড় এড়ানোর জন্যে বামা এক অদ্ভুত পরিমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে বসলেন। তিনি যখন তখন প্রচুর কারণ-বারি পান করতে লাগলেন। গাঁজাও খেতে লাগলেন যখন তখন।

কিছু দিন বাদে কৈলাসপতি বাবা ও মোক্ষদানন্দ তারাপীঠ ছেড়ে চ'লে গেলেন।

বামা বৃত হলেন তারাপীঠের প্রধান কৌলপদে।

বামা তারাপীঠের অধিনায়ক হলেন বটে, তবে তাঁর খাবার দাবারের বাদ-বিচার আদৌ ছিল না। খাদ্য শুদ্ধ কি অশুদ্ধ; খাদ্য না অখাদ্য; খাবার যে খেতে দিচ্ছে তার জাত কি ;—এসব তাঁর কাছে কিছুই না। দেবতা, মানুষ, কুকুর—এ সবের ভেদজ্ঞান একেবারেই দূর হ'য়ে গেলো। তাঁর কাছে দেবতার প্রসাদ আর জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য, এর মধ্যে রুচি-অরুচির প্রশ্নই রইলো না। তিনি প্রায়ই কুকুরের সঙ্গে এক পাতায় খেতেন। হয়ত কুকুরের উচ্ছিষ্টও খেয়ে চলেছেন।

তারা মা-র মন্দিরে সারা রাত বামা তারা তারা ক'রে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন। সচকিত হ'য়ে পড়েন আশেপাশের ভক্তরা। কখনও বা সারারাত-ই রইলেন ধ্যান-মগ্ন হ'য়ে। দীর্ঘকাল কেটে গেলো। সমাধি ভঙ্গ হোলো। ঠিক তার পরেই ব'সে রইলেন একেবারে জড়ের মত। এ অবস্থায় শুচি-অশুচির ভেদজ্ঞান একেবারেই থাকতো না। এক একদিন বামার মলমূত্র থুতুতে মন্দির একেবারে নোংরা হ'য়ে পড়তো। দুর্গন্ধে ওখানে যাওয়াই কষ্টকর হোতো।

মন্দিরের লোকেরা একেবারে ক্ষেপে গেলো। তারা মা-র মন্দির এইভাবে অপবিত্র করা বরদাস্ত করতে পারলো না তারা।

তারা মা-র জন্যে সবে ভোগ এনে রাখা হয়েছে। তখনও ভোগ নিবেদন করা হয়নি। হঠাৎ বামা এসে সে ভোগ খেতে শুরু করলেন।

আরে, ক্ষ্যাপা করে কি। করে কি।

বাধা দিতে এলো কেউ কেউ।

মা আমায় খেতে বলেছে।

মা খেতে বলেছে। তবে রে!

বামাকে কয়েকজন চরম লাঞ্ছনা করলো। প্রহার পর্যন্ত করলো। দিলো মন্দির থেকে বের ক'রে। বামাকে আর মন্দিরে ঢুকতে দেবে না ঠিক করলো তারা। খেতেও দেবে না। দিলেও না। বামা রইলেন উপোসী। না খেয়েই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বামা।

ঠিক এমনি সময়ে দূরবর্তী নাটোর রাজপ্রাসাদে এক চাঞ্চল্যকর অালৌকিক ঘটনা ঘটে গেলো।

নিঝুম রাত্রি।

নাটোর রাজপ্রাসাদে রাণী অন্নদাসুন্দরী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হঠাৎ তিনি এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন।

তাঁকে কে যেন ডাকছেন।

আর ঘুমিও না। ওঠো। শোনো আমার কথা।

হঠাৎ সারা ঘর আলোয় আলোময় হ'য়ে উঠলো। আর, সেই আলোকমণ্ডলের মধ্যে আবির্ভূত হলেন তারা মা। সর্ব অঙ্গে তাঁর দিব্য বিভা। কিন্তু মুখখানি বিষাদ-মাখা। মায়ের দুই চোখ বেয়ে জল ঝরছে।

বড় দুঃখের সঙ্গে তিনি বললেন, আমি তোমাদের তারা মা।

বহুদিন যাবত আমি তারাপীঠে রয়েছি। কিন্তু আর আমি থাকতে পারছি নে। মন্দির ছেড়ে যেতে হবে।

কেন মা? কি হয়েছে? কোন্ অপরাধে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?—বড় ব্যাকুল হ'য়ে রাণী জিজ্ঞাসা করলেন।

কি হয়েছে? মন্দিরের পুরোহিত আর দরওয়ান, এরা সবাই মিলে আমার ছেলে ক্ষ্যাপাকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে। তাদের

সেই প্রহার লেগেছে আমার সকল অঙ্গে। এই গ্যাখো, আমার সর্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন। আর, শুনবে? এই প্রহার করা হয়েছে অতি সামান্য কারণে। মন্দিরে আমার বিগ্রহের সামনে তখন ভোগ রাখা হয়েছে। নিবেদন করা তখনও হয় নি। পাগল ছেলের মুখখানা বড়ই শুক্‌নো দেখলাম। মনে হোলো, তার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তাই তাকে ডেকে বললাম, ক্ষ্যাপা, আয়। কত খাবার রয়েছে! খেয়ে নে। আমার কথায় সে মন্দিরে ঢুকে খেতে বসেছিল। এইমাত্র তার অপরাধ। আজ চারদিন তারা আমার ক্ষ্যাপাকে প্রসাদ দেয় নি। কিছুই না খেয়ে সে শ্মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরে, ছেলে অনাহারে থাকলে মা খেতে পারে? আমিও তাই চারদিন কিছুই খাই নি।

রাণী ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতেই মিনতি করলেন।

না মা, পায়ে পড়ি। মন্দির ছেড়ে যেও না। এর প্রতীকার আমি এক্ষুনি করছি। এখন থেকে তোমার ছেলের আর কোনও অসম্মান, লাঞ্ছনা ঘটতে দেবো না। তুমি থাকো, মা। যেমন আছ, তেমনিই থাক। তুমি মন্দির ছেড়ে যেও না।

রাণী কাঁদতেই লাগলেন।

আশ্বস্ত হলেন তারা মা।

বেশ। তারাপীঠ ছেড়ে যাবো না। তবে আজ থেকে এই ব্যবস্থাই করো, রোজ আমার ভোগের আগে আমার পাগল ছেলে ক্ষ্যাপাকে খেতে দেওয়া হবে।

তাই হবে মা। অবশ্যই তাই হবে। এখন থেকে তারাপীঠে ভোগ নিবেদনের আগেই তোমার ছেলেকে খাওয়ানো হবে। আরও কথা দিচ্ছি মা। তোমার ছেলে ক্ষ্যাপার সেবা পরিচর্যারও এখন থেকে আর কোনও ত্রুটি হবে না।

দেবীর মুখ প্রসন্ন হোলো। তিনি অন্তর্হিতা হলেন।

রাণীর ঘুম ভেঙে গেলো—ভয়ে, বিস্ময়ে, করুণায় আর আশ্বাসে।

কে এই ক্ষ্যাপা? কী মহাভাগ্যবান সাধক সে!

ব্রহ্মময়ী তারা মা-র এত প্রিয় পাত্র, আদরের দুলাল সে! কী অপূর্ব একান্তকতা এই ক্ষ্যাপার সঙ্গে তারা মা-র! নইলে তাঁর দেহের আঘাত মায়ের দিব্য অঙ্গে কেন এমন ক'রে লাগে!

ভোর হোলো।

রাণী দেওয়ানজীকে ডাকিয়ে আনলেন। সব কথা জানালেন তাঁকে।

কত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রে নাটোরের নিজস্ব মৌজার বিনিময়ে আসাদুল্লা খাঁর মৌজা এই তারাপীঠকে রাজসরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধ তারাপীঠের কোনও অবমাননা না হয়, তারা মা-র সেবার কোনও রূপ বিঘ্ন না ঘটে, সেই জন্যেই তো এত কিছু করা হয়েছিল! কী দুরদৃষ্ট আমাদের! আমাদেরই সেবা-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে মা আমার আজ চারদিন উপবাসী রয়েছেন। এ কষ্ট আমি সইতে পারছি নে। সইতে পারছি নে।

রাণী আকুল হ'য়ে কেঁদে ফেললেন।

দেওয়ানজী তখনই রাজ-সরকারের হুকুম-নির্দেশ দিয়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পাঠালেন তারাপীঠে।

কর্মচারী এলেন তারাপীঠে। দেবীর স্বপ্নাদেশ জানালেন সবাইকে। জানালেন রাণীর হুকুম। মন্দিরের পুরোহিত ও দরওয়ানকে শাস্তি দেওয়াও হোলো।

তারাপীঠের সকলের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। ক্ষ্যাপার ভাগ্যের কথা শুনে সবাই বিস্মিত হলেন। তাঁর সাক্ষাৎ- পেয়েছেন জেনে অনেকে নিজেদের ভাগ্যবান ব'লে মনে করলেন।

কিন্তু ক্ষ্যাপা কোথায়? তাকে তো কেউ কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

একবার এসেছিলেন মন্দির দরজায়।

না না। আর আমি তোর মন্দিরে যাবো না। কত আদর!

ও ক্ষ্যাপা, তুই অত রোগা হ'য়ে গেছিস্ কেন? খেতে পাস্নি বুঝি? তোর খাবার ভাবনা কি? ওই তো আমার ভোগ রয়েছে, খা না। তুই নিজে ডেকে খেতে ব'লে আমাকে মার খাওয়ালি!

অভিমান করিস্ নি, বাবা! ওরা তোকে মারে নি। আমায় মেরেছে। শুধু তুই উপবাসী নেই। আমিও চার দিন কিছু খাই নি।

সে কি মা! তুমি উপোসী রয়েছো!

তবে যা। মন্দিরে যা। নাটোর থেকে কর্মচারীরা এসেছেন। তোকে খুঁজছেন। তাঁরা সবাই দুঃখ করছেন। আর এমনটি হবে না। তুই যা। মন্দিরে যা।

রাজকর্মচারী এসেছেন শুনে ক্ষ্যাপা কিছুটা ভয়ও পেয়েছেন। ভয়ে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে পাওয়া গেলো। তাঁর তখনও ভয় যায় নি। একেবারে ছোট্ট শিশু যেন একটা মহা অন্যায় কাজ ক'রে ধরা পড়েছে।

কর্মচারী রাজতরফ থেকে ক্ষ্যাপার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

ক্ষ্যাপা চেঁচিয়ে উঠলেন। তারা তারা! তারা তারা!

এখন থেকে স্থায়ী নির্দেশ রইলো, তারা মা-র ভোগের আগেই তারা মা-র ছেলে ক্ষ্যাপাকে খাইয়ে নিতে হবে।

রাজকর্মচারী ষোড়শোপচারে তারা মা-র পূজো দেবেন।

সকলেরই ইচ্ছে ক্ষ্যাপা পূজো করেন। রাণীমা-ও তাই জানিয়ে দিয়েছেন।

বহু লোক এসেছেন পূজো দেখতে।

ঢাক ঢোল বাজতে লাগলো।

ক্ষ্যাপার আজ ভা-রী আনন্দ পূজোর আয়োজন দেখে। কী ঘটা!

বসলেন পূজোয়। জলশুদ্ধি নেই। আসনশুদ্ধি, আচমন এ-সব কিছুই নেই।

আসনে ব'সে তারা মা-র দিকে তাকিয়ে বামা হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন—

বাঃ, বেটির আজ ভা-রী মজা। পেট ঠুসে খাবে।

পরক্ষণেই বললেন—

তুই বেটি তো পাষাণী, নিষ্প্রাণ। তুই আবার খাবি কি ?

ক্ষ্যাপা কোনও দিকে না চেয়ে নিজেই খেতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ হ'ল।

কৈ গো, কালাচাঁদ কাকা, পাঁঠা বলি দাও না। দেরী করছো কেন ?

ঘাতকের খড়্গ নিয়ে খড়্গের উপর ছুটো ফুল দিলেন।

কালাচাঁদ কাকায় ফট্।

খড়্গ পূজোও হ'ল।

পূজোর ধরন দেখে পূজারী বললেন, বাবার সবই উল্‌টো। পূজোর আগেই ভোগ গ্রহণ আর পাঁঠা বলি হ'য়ে গেলো।

হ্যাঁরে, হ্যাঁ। তো শালারা কি জানবি ?

পূজো শেষ। এইবার পুষ্পাঞ্জলি।

দুহাতে রক্তজবা আর পদ্মফুল নিয়ে তারা মা-র সামনে দাঁড়িয়ে বামা তারা মাকে কতই না বকলেন ! পরক্ষণেই কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতেই, বলতে লাগলেন।

এই লে বেটি ফুল। এই লে বেলপাতা।......

দু'চোখ দিয়ে ফোয়ারার মত জল ঝরতে লাগলো।

হঠাৎ ক্ষ্যাপার সমাধি হোলো। সেদিন সে সমাধি আর ভাঙ্গলো না। ভাঙ্গলো পর দিন।

পূজো দেখে সবাই কাঁদতে কাঁদতে সেস্থান ত্যাগ করলেন। সকলেরই মনে মহা-শান্তি। পরম পবিত্রতা।

আর এক দিনের ঘটনা।

ক্ষ্যাপা প্রায়ই ধ্যানাবস্থায় সমাধিতে ডুবে থাকেন। কখনও বা

হ'য়ে পড়েন একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন। আবার কখনও বা নেহাৎ ছোট্ট ছেলেটির মতোই আচরণ করেন।

একদিন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ক্ষ্যাপা তারা মা-র গায়ে মূত্র ত্যাগ ক'রে বসলেন।

পুরোহিত আর পাণ্ডারা হায় হায় ক'রে উঠলেন। কেউবা ক্ষ্যাপাকে গালি দিতে লাগলো।

ক্ষ্যাপা তখন যেন ছোট্ট একটি ছেলে। ধমক খেয়ে একটুও ভয় পান নি। বরং সহজ সত্য কথাটাই ব'লে ফেললেন।

বেশ করেছি। আমার মা-র গায়ে আমি মুতেছি। তোদের কিরে, শালারা?

এর চাইতে স্পষ্ট জবাব আর কি হ'তে পারে?

তবুও সবাই পড়লেন মহাসংকটে। তারা মা-র পবিত্র বিগ্রহ অপবিত্র করা হোলো না তো! কি করা যায় এখন?

উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা নাটোর রাজদরবারে খবর পাঠালেন।

এবারও মায়ের প্রত্যাদেশ এলো।

যদি আমায় শুদ্ধ করিস্ তবে আমি মন্দির ছেড়ে চলে যাবো। ছেলে চিরকালই মায়ের কোলে মলমূত্র ত্যাগ ক'রে থাকে, তাতে কি মা অপবিত্র হয়?

কর্তৃপক্ষ তাই জানিয়ে দিলেন, তারা মা-র পূজো আগের মতোই চলতে থাকবে। ক্ষ্যাপা বাবা স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ। মায়ের আদরের দুলাল। তাঁর কোনও কাজেরই ত্রুটি ধরবার প্রয়োজন নেই। অধিকারও নেই আমাদের। এ ক্ষেত্রে দেবীবিগ্রহ অপবিত্র হয়েছে এ প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ হোলো মায়ে-পোয়ের নিজস্ব ব্যাপার। বাইরেকার কারও এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন দেখিনে।

মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপা তারা মা-র পূজোয় এসে বসেন।

ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি পূজো করতে এলেন। শুধু তারা তারা! তারা তারা! হাত কাঁপতে লাগলো। পরণের কাপড় খুলে গেলো।

তিনি কখনও আনন্দে অধীর হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে তারা তারা ব'লে নাচতে লাগলেন। কখনও বা পাগলের মত প্রলাপ বকতে লাগলেন। কখনও বা অস্ফুটে কত কি বললেন!

এবার ক্ষ্যাপা পূজো করতে আসনে বসলেন। মন্ত্রপাঠ নেই। তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র নেই। প্রাণায়াম নেই। ভূতশুদ্ধি নেই। অঙ্গন্যাস করন্যাস নেই। আসনশুদ্ধি জলশুদ্ধি এ-সব নেই। এমন কি চান করাও নেই। আছে কেবল ভক্তি।

তারপর অঞ্জলি। বেলপাতা, জবা ফুল অঞ্জলি দেন বারবার। কাঁদতে থাকেন।

এই বেলপাতা লে মা। এই অন্ন লে। এই জল লে। এই বলিদান লে। এই ফুল লে। এই ধূপ লে। এমনি ক'রে সমস্ত পূজোর দ্রব্যসামগ্রী তিনি মাকে নিবেদন করলেন।

তারপর, গোমস্তা বাবারা লও। পাণ্ডা বাবারা লও। বেণী বাবা লও। অমৃতবাবা লও। রাম বাবা লও। কালাচাঁদ বাবা লও। এইভাবে মায়ের বাড়ীর সকল কর্মচারীর নামেও এক একটা পুষ্পাঞ্জলি দান করলেন।

ভাবুক ছাড়া, ক্ষ্যাপার হৃদয়ের ভাব বোঝা সহজ কথা নয়। তারা মাকে আজ ক্ষ্যাপা সর্বভূতেই অনুভব করছেন।

পূজো করা হ'য়ে গেলো।

একজন ভক্ত ক্ষ্যাপাকে রোজ পূজো করতে বললেন।

রোজ রোজ অত ক'রে খোসামোদ করতে আমি পারবো না। আর কি জান, বাবা, আমার ওসব ঠিক ঠিক হয় না। মায়ের সামনে বসলেই আমি সব ভুলে যাই। মন্ত্রতন্ত্র তো কোন্ ছার! তা-ও তো ভালো জানিনে। আমি নিজেকেই ভুলে যাই। এমন হ'লে কি পূজো হয়?

একদিন ক্ষ্যাপা তারা তারা ব'লে গগন বিদীর্ণ করছেন। এমন সময়ে কয়েকজন ভক্ত গাইতে গাইতে এলেন তারা মা-র মন্দিরে।

যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুই দেখ মন আর আমি দেখি, আর যেন কেউ
না দেখে।……

গানটি ক্ষ্যাপার বড়ই ভালো লাগলো।

বেঁচে থাক্‌রে, শালারা। বেঁচে থাক্‌!

তিনি ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। কেঁদে আকুল হলেন। তুই দেখ. মন, আর আমি দেখি। কেবল তুই দেখ. মন আর আমি দেখি·· ···। আহা!

সেদিন শিবরাত্রি।

সবাই ক্ষ্যাপাকে ধরলেন, আজ আপনাকে পূজো করতে হবে। ক্ষ্যাপার তখন ভাবসমাধি অবস্থা।

ক্ষ্যাপা রাজী হলেন না। আনন্দময় পুরুষ তিনি। আজ তিনি মা নামে বিভোর। আজ কি তাঁর পক্ষে এই বাহ্যিক পূজো করা সম্ভব?

সবাই পূজো দেখে চ'লে গেলেন। ক্ষ্যাপা ধীরে ধীরে মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন বাইরেকার কেউ নেই। মায়ে-পোয়ে নির্জনে কত কথাই না হোলো। ঝগড়াও হোলো!

পরদিন ভোরে নাটমন্দিরে বসে ক্ষ্যাপা একা একা কাঁদছিলেন। প্রধান পাণ্ডা এলেন।

বাবা, কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে?

ক্ষ্যাপা তখন যেন নেহাৎ ছোট্ট একটি ছেলে। নিজের গালে চড়ের দাগ দেখিয়ে বললেন,

তো শালারাই তো আমাকে লষ্ট করলি। আমাকে মার খাওয়ালি। এই ছাখ্‌ কি হয়েছে। হ্যাঁ, এবার আমি তোদের কাছ থেকে সরবো। মা আর আমাকে এখানে রাখবে না।

এই কথা ব'লে ক্ষ্যাপা দৌড়ে মন্দিরের ভিতরে চ'লে গেলেন। বিড় বিড় করে কত কথা কইলেন। শেষে মাকে সন্তুষ্ট ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন।

একদিন ক্ষ্যাপা মন্দিরে প্রবেশ ক'রেই বললেন —

কি গো বেটি, ছেলে পড়ে রইলো একধারে আর মা এখানে খেয়ে দেয়ে বেশ আনন্দ করছে। এই কি মায়ের ধারা?······যাও, যাও। আর তোমার আদরে কাজ নেই। বামা, বামা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? হ্যাঁরে, সারাদিন যে তোকে মন্দিরে দেখতে পাইনি। এত বারফট্‌কা হয়েছিস্ কেন? এখন কাছে এসেছি বলেই বুঝি মায়া উথ্‌লে উঠ্‌লো! থাক্ থাক্। আর তোমার আদর করতে হ'বে না।

ভক্তগণ দেখলেন, ক্ষ্যাপা মা-র সাথে ঝগড়া করছেন। তাঁরা চেঁচিয়ে তারা তারা ক'রে উঠলেন।

সেদিন সারারাত ক্ষ্যাপা কখনও অস্ফুট স্বরে কখনও বা আপন মনে মাকে কত কি বকলেন। ক্ষ্যাপার দৃষ্টি কখনও ফ্যালফেলে। নজর নেই তাঁর কোনও দিকে। দেখলে মনে হয়, কোনও সরল শিশু মা-র সঙ্গে বহুক্ষণ বাদে সাক্ষাৎ হয়েছে ব'লে কত অভিমান করছে, আবদার করছে।

মাঝে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে পড়লেই তারা তারা ব'লে চীৎকার করছেন। এক সময়ে ভক্তদের ডেকে বললেন, ওরে শাস্‌তোর টাস্‌তোর রেখে কেবলই নাম কর। নাম ভিন্ন গতি নেই। নাম কর।

ক্ষ্যাপা প্রায়ই দিগম্বর অবস্থায় বেড়ান। কেউ কিছু বললে তিনি বলেন,

আমার বাবা নেংটা, মা নেংটা। আমারও তো ঐ অভ্যাসটা হওয়া চাই। তা ছাড়া, আমি তো লোকালয়ে থাকি নে। থাকি আমার মায়ের সঙ্গে, মায়ের শ্মশানে। আমার আবার কাকে ভয়? কাকে সংকোচ? তারা তারা!

কোনও ভক্ত আসলে কত সরল সোজা কথাই বলতেন ক্ষ্যাপা। তাতে না থাকতো পাণ্ডিত্যের আভাষ, না থাকতো বুদ্ধির মার-

প্যাচ। ব্রজে নাকি কানু ছাড়া গীত নেই। ক্ষ্যাপার কাছেও তারা মা ছাড়া আন কথা নেই।

এক ভক্ত এসেছেন।

অনেক দিন আপনার চরণ দর্শন করিনি। তাই একবার আপনার চরণ দর্শন করতে এলাম।

এ আগুড়ে পা দেখে কি হবে, বাবা? পা দেখতে চাও তো তারা মা-র সেই খুর খুরে রাঙা পা দুখানি দেখো। তা'হলে আর দেখার সাধ কিছুই থাকবে না। সেই দেখাতেই সব দেখার সাধ মিটে যাবে।

বাবা, সে দেখা কি সহজ?

খু-ব সহজ। ছেলে মাকে দেখবে। তার আর শক্তি কি। মাকে কেঁদে ডাকলেই সে বেটি দেখা দেয়। ভক্তি আর বিশ্বাস থাকলে মাকে পেতে আর কিছুই শক্ত নয়। আমি, বাপু, অত যোগ-যাগ বুঝিনে। কেবল সময় নষ্ট। যখন কেঁদে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়, তখন অত কষ্ট কেন?

একদিন একজন ভক্ত বললেন, প্রভু আমাদের বাড়ীর কাছে একজন তান্ত্রিক সাধু এসেছেন।

তিনি সংসারী না সন্ন্যাসী?

সন্ন্যাসী।

তবে তুই তার বিষয় কি বুঝবি?

তাঁর কাজ কর্ম দেখে শুনে ঘেন্না হয়।

ঐ ত দরকার।—ব'লেই হো হো করে হাসতে লাগলেন।

যাকে সবাই ঘেন্না করে, তাকে মা কোলে করে, তা জানিস্?

প্রভু, হাসবেন না। আমি একজন গৃহীকেও অমন দেখেছি। সে খুব মদ মাংস খেতো। কিন্তু শাস্ত্রে তো অন্য রকম আছে, আপনি বলেছেন।

সে সংসারী শালা বেদো, বেদো। মায়ের নাম ক'রে যে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে, তার নাম করতে নেই।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এসব শাস্ত্রে আছে।

তার গুষ্টির মাথা। শাস্ত্র কি আবার লোক হাসাবার উপদেশ দেয়? যারা কিছুই জানে না, তারাই কেবল তারা মা-র শাস্‌তোরটাকে নষ্ট করে। সে শালারা বেদো।

তবে শাস্ত্রে কি আছে, বাবা?

আমি অত শাস্‌তোর টাস্‌তোর জানিনে, বাপু। তারা মাকে নিয়েই কারবার। তাঁকে জানলেই হোলো। তারা তারা!

কোনও ভক্ত আসলেই ক্ষ্যাপা বলতেন, কি হুকুম, বাবা?

প্রভু, আপনার চরণ-ধুলো নিয়ে পবিত্র হবার জন্যে এসেছি।

না বাবা, আমি প্রভু হবার উপযুক্ত নই। আর, মানুষ মানুষের চরণ-ধুলো নিয়ে পবিত্র হ'তে পারে না। যদি পবিত্র হ'তে চাস্, যদি সব ভাবনা এড়াতে চাস্—যা না মা-র মন্দিরে। আমার মা আছেন। তাঁর পায়ের ধুলো লিগে যা। বিধি বিষ্ণু যাঁর ধুলো নেয়, ভোলা যাঁর পায়ের তলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যায়, যা না। যা না মা-র কাছে। তা হ'লে আর এমন ক'রে আসা যাওয়া করতে হবে না। সব সন্দেহ মিটে যাবে। পাগলের কাছে কেন, বাবা?

একদিন একজন পণ্ডিত এলেন ক্ষ্যাপার কাছে।

একজন ক্ষ্যাপাকে বললেন, বাবা, ইনি একজন ভালো লোক। স্কুলের ছেলে পড়ান। পাশ করা পণ্ডিত।

বেশ ভাল, বাবা। পণ্ডিত বাবা। ভাল বাবা। আমি মুখ্খু, বাবা। পাশ টাশ কিছুই নেই।

আপনি যে পাশমুক্ত, বাবা। অষ্টপাশ-মুক্ত। সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ জীব আপনি। অন্য পাশে আপনার কি দরকার?

পাশ না ফাঁস। যার য-টা পাশ, তার ত-টা ফাঁস বা বন্ধন। এ কথা ঠিক, বাবা।

তা কেমন ক'রে, বাবা? তা-ও কি কখনো হয়?—বললেন আর একজন।

আঃ ম'লো। কেমন ক'রে হয়, তা-ও জান না? এই ডাক্তার মনে করে, আমি ডাক্তারী পাশ। হাকিম মনে করে, আমি এম্ এ পাশ। রাজা মনে করে, আমি রাজ্য চালানোয় পাশ। যদি সব সময় এটা পাশ পাশই মনে হ'তে লাগলো, তা হ'লে, আমি ভগবানের দাস, এটা মনে হবে কেমন ক'রে? এই পাশ করা দাস করাটায় বাধা দেয় ব'লেই তো বন্ধন। যার মনে তা নয়, তার ভালোই হয়।

হ্যাঁ, বাবা, এ কথা ঠিক বটে!

আর একজন বললেন, হ্যাঁ, কতকটা বুঝলাম বটে। সব সময়ে দাস দাস মনে করাটাই দরকার। পাশ পাশ মনে করার দরকার নেই।

বামা চোখ লাল ক'রে বললেন, দরকার নেই! ওতে কি আছে? শুধু অহঙ্কার!

সেদিন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে।

একজন ভক্ত গাইছিলেন—

হরি বোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল।
ফুরালো খেলা, ভাঙ্গলো মেলা, আর কেন বিলম্ব বল॥
বিদেশে প্রবাসে, ভব পান্থবাসে, কিছু আর লাগে না ভালো।
বাড়ী পানে মন ছুটেছে এখন, মা মা ব'লে ঘরে চল॥
মায়ের আনন করি দরশন তাপিত প্রাণ হবে শীতল।
আছেন জননী দিবস রজনী আশাপথ চেয়ে কেবল॥
মায়ের প্রাণ টানে সন্তানের পানে, হেরিলে নয়নে ঝরে জল।
আহা মা আমার, প্রেমের আধার, আপন প্রেমে আপনি বিহ্বল॥

মনের কথাটা গানে ঠিক ঠিক প্রকাশ করা হয়েছে জেনে বামা গায়ককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

বাড়ী যাবার ভাব জেগেছে। মায়ের কোল মনে পড়ছে। আজ কেবল ঐ রকমেরই গান গাও, বাবা।

ভক্ত গাইলেন,

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।······

ক্ষ্যাপা ধুলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

মহাপ্রয়াণের লগ্ন এসে পড়লো।

ভক্তরা তা বুঝতে পেরেছেন। ভক্তদের একজন না একজন তাই সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। একজন না একজন তাঁর আজ্ঞা পালন করবার জন্যে কাছে কাছেই ফেরেন।

বামার এতে বড়ই রাগ।

তো শালারা যে এখন বড় নেটাপেটি হয়েছিস্ দেখছি। পাগলের সাথে এত মাখামাখি কি ভালো? তোদের কি মাগ ছেলে বাড়ীঘর এসব কিছু নেই? যা না, নিজের কাজ করগে যা। পাষাণের সাথে এত প্রেম কেন? মনে করেছিস্, সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমায় আটকাতে পারবি?

ভক্তরা এই কথা শুনে কেঁদে ফেললেন।

বাবা, এ কি বলছেন? তা হ'লে আমাদের উপায় কি?

উপায়? উপায় মায়ের পায়ে। যা করবার তিনি-ই করেন। একটা উপায় তিনি করবেন-ই। আমায় তিনি আর রাখবেন না। এ কথা আজ দু তিন দিন হোলো হ'য়ে গেছে। তুই যেন এ কথা কারু কাছে ব'লে ফেলিস্ নে। তোকে খুব ভালবাসি কি না তাই বলনুম।

এর পরে একদিন বামা নাটমন্দিরে মা-র মুখের দিকে চেয়ে ব'সে আছেন। চোখের পলক পড়ে না। বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ছে।

এমন সময়ে একজন ভক্ত এসে গাইলেন—

এত কাছে কাছে, হৃদয়েরি মাঝে, রয়েছ তুমি হে হরি।
আমি ভাবি মনে, কত দূরে তুমি, রয়েছ আমায় পাশরি॥
ছায়াবাজী ক'রে, কত খেলা ক'রে, আড়ালে লুকায়ে থেকে।
আমাদের ল'য়ে, লীলামত্ত হ'য়ে, রেখেছ আপনা ঢেকে॥
কি ফুল ফুটেছে, কোন্ বনমাঝে, মত্ত হ'য়ে অলি ধায়।
তোমার কারণে, তব অন্বেষণে, প্রাণ কোথা যেতে চায়॥

গান শুনেই বামা সমাধিমগ্ন হলেন। বহুক্ষণ পরে সে সমাধি ভাঙ্গলো।

বাবা, আজ কেবল আনন্দ কর। আজ কেবল ভগবানের নাম কর। তারা তারা!

১৩১৮ সনের শ্রাবণ মাস।

সেদিন অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

বামা বললেন, দেখুন লগেন বাবা, ঐ নিমতলায় বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বাবার সমাজের কাছে আমায় উত্তর মুখ ক'রে বসিয়ে সমাজ দেবেন। তারা তারা!

তারা মা-র ক্ষ্যাপা ছেলে, আদরের দুলাল তারা তারা বলতে বলতেই লাভ করলেন তারা মা-র কোলে স্থায়ী আসন।

তারা তারা! তারা তারা!

——

গোস্বামী শ্যামানন্দ

দুঃখী।

বাবার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। মায়ের নাম দুরিকা।

জাতিতে এঁরা সদ্‌গোপ।

এঁদের আদি নিবাস ছিল সুবর্ণরেখা নদীতীরে দণ্ডেশ্বর গ্রামে। পরে এঁরা খড়্গাপুরের কাছে ধারেন্দা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করেন।

এ দম্পতির পরপর কয়েকটি সন্তান হয়। অকালেই তারা গত হোলো।

শেষেরটি দৈবক্রমে বেঁচে যায়। তাই বাবা নাম রাখলেন দুঃখীরাম। গাঁয়ের লোকেরা ডাকে দুঃখী বলেই।

জন্ম এঁর ১৪৫৬ শকে।

এই দুঃখীরামই উত্তরকালে শ্যামানন্দ গোস্বামী নামে সারা ভারতের বৈষ্ণব-সমাজে পরিচিত ও সম্মানিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীজীব গোস্বামীর ইনি বিশেষ স্নেহ ও কৃপা লাভ করেছিলেন। শেষ জীবনে শ্যামানন্দ উৎকল ভক্ত সমাজের নেতারূপে মর্যাদা লাভ করেন। শত শত উড়িয়া বৈষ্ণব শ্যামানন্দ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা লাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন।

বাবা চেয়েছিলেন দুঃখীরাম লেখাপড়া শিখুক। হোক বড় পণ্ডিত। চতুষ্পাঠী খুলবে। দেশ-বিদেশ থেকে পড়ুয়ারা এসে এই চতুষ্পাঠীতে পড়বে। নাম হবে চতুষ্পাঠীর। খুব নাম হবে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দুঃখীরামের। বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যাতে; বিদ্বান সকল জায়গায়, সারা দেশে পূজা পান। কৃষ্ণদাসের পুত্র বিদ্বান দুঃখীরাম দেশের সর্বত্রই সম্মানিত হবে, পূজিত হবে। দুঃখীরাম। তাঁর একমাত্র পুত্র দুঃখীরাম।

এই সঙ্কল্প নিয়েই কৃষ্ণদাস দুঃখীরামকে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে

পাঠালেন। সংস্কৃত পড়তে লাগলো সে। ছিল তাঁর অপূর্ব মেধা। সাহিত্যে ও শাস্ত্রে দক্ষতা এলো দ্রুত।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। কৈশোরেই দুঃখীরামের জীবনে দেখা দিলো বৈরাগ্য। ধর্মে প্রবল অনুরাগ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসেছেন নীলাচলে। রইলেন তিরোধান পর্যন্ত। সারা উড়িষ্যায় তাঁর প্রেম-ভক্তির উচ্ছল প্রবাহ! জলের যে তোড়ে মত্ত হাতীও ভেসে যায়, এ যেন সেই রকমেরই উত্তাল প্লাবন। প্রেমের সে ঢলে ভেসে গেলো উড়িষ্যার আপামর জনসাধারণ। ভেসে গেলেন প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ প্রতাপরুদ্র। বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, এঁরাও ভেসে গেলেন।

গৌড়ীয় মহাভক্তগণ অদ্বৈত প্রভুকে সামনে নিয়ে হাঁটাপথে নবদ্বীপ থেকে প্রতি বছর রথের আগে কীর্তন করতে করতে নীলাচলে আসেন। থাকেন কিছুকাল। আবার ফিরে যান দল বেঁধে সারা পথে কীর্তন করতে করতেই। এ প্লাবনও পথের দুই দিকে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে।

এই প্লাবনে পড়লো কৃষ্ণদাসের বংশ। পড়লেন বিশেষ ক'রে বৈরাগ্য-পূত দুঃখীরাম।

দুঃখীরাম চতুষ্পাঠী ছাড়লেন।

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা নাহি আর॥

কৃষ্ণভক্তিই পরাবিদ্যা। ঈশ্বরে ভক্তিমান হবে ব'লেই তো লোকে পড়তে চায়।

পড়ে কেন লোক? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?

কিশোর বয়সেই দুঃখীরাম সঙ্কল্প করলেন, তিনি বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নেবেন। হবেন একজন বৈষ্ণব।

দুঃখীরাম শুনেছেন কালনার পরম ভাগবত পণ্ডিত হৃদয়চৈতন্য

ঠাকুরের নাম। তাঁর বড় সাধ, তিনি যাবেন কালনায়। দীক্ষা নেবেন ঠাকুর হৃদয়চৈতন্মের কাছে।

মা ও বাবার কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁদের জীবনেও তো মহাপ্রভুর প্রভাব পড়েছে। খুবই দুঃখের কথা! অনুমতি দেওয়া সহজ কথা নয়। তবুও তাঁরা অনুমতি দিলেন। গৌর কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে?

বাবা বললেন, কুল পবিত্র করো, বাবা। আশীর্বাদ করি, প্রকৃত বৈষ্ণব হও।

মা নীরবে আশীর্বাদ করলেন, তোমার যাত্রা শুভ হোক। মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

মা ও বাবা দুজনেই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন।

তোমার ধন তোমার কাজেই চললো। দেখো, প্রভু, তুমি দেখো।

মা ও বাবাকে প্রণাম ক'রে দুঃখীরাম রওনা হলেন।

এ সময়ে দুঃখীরামের বয়স মাত্র ২০ বছর।

কালনা বহুদূর? তা হোক। হৃদয়ের আবেগ, মহাপ্রভুর আকর্ষণ যে প্রবলতর। পথরোধ করবে কে?

কালনায় এলেন দুঃখীরাম। এই দীর্ঘ পথ এলেন পায়ে হেঁটেই। জয় মহাপ্রভু!

কে না শুনেছে কালনার শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দিরের কথা? কে না জানে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গৌরীদাস পণ্ডিতের সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ম ও প্রভু নিত্যানন্দের অপূর্ব লীলাবিলাসের কাহিনী?

দুঃখী কালনায়ই এলেন। এলেন শ্রীহৃদয়চৈতন্ম ঠাকুরের কাছে। তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করবেন।

একটু পিছনে তাকাই।

সূর্যদাস ও গৌরীদাস—দু' ভাই।

সূর্যদাস সরখেল ও গৌরীদাস সরখেল। সূর্যদাস বড়, গৌরীদাস ছোট। নিবাস এঁদের অম্বিকা কালনায়।

এই সূর্যদাসেরই দুই মেয়ে বসুধা দেবী ও জাহ্নবা দেবীকে প্রভু নিত্যানন্দ বিবাহ করেছিলেন।

আর গৌরীদাস? গৌরীদাস পণ্ডিত নামেই সারা বৈষ্ণব সমাজে ইনি পরিচিত ও অভিনন্দিত ছিলেন। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম এই গৌরীদাস ছিলেন পূর্বলীলায় সুবল সখা।

গৌরীদাস একজন মহাভাগবত। মহত্তম বৈষ্ণবদের মধ্যে অন্যতম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন গৌরীদাস।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে সঙ্গে ক'রে নিজেরাই নৌকোর বৈঠা বেয়ে বেয়ে গৌরীদাস পণ্ডিতের বাসভবনে এসে উপস্থিত হলেন। এসে তাঁরা দুজনে এক তেঁতুল গাছের তলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন।

মহাপ্রভুকে পেয়ে গৌরীদাসের আনন্দের অবধি নেই। গৌরীদাস প্রাণ ভ'রে তাঁর ও প্রভু নিত্যানন্দের সেবা করলেন।

মহাপ্রভুকে ছেড়ে দিতে গৌরীদাসের মন চায় না। চিরদিনের মত তাঁকে রাখবার জন্যে বহু মিনতি করতে লাগলেন।

আমার বচন রাখ অম্বিকা নগরে থাক
এই নিবেদন তুয়া পায়।

গৌরীদাস কেঁদে ফেললেন।

কান্দি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদতলে
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী।

মহাপ্রভু ত্বরিতে সেখানকার একটা নিমগাছ কেটে এনে নিজের ও নিত্যানন্দের দুখানি সুন্দর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করালেন।

গৌরীদাসকে এই বিগ্রহযুগল অর্পণ ক'রে তিনি বললেন,

পণ্ডিত, না-ই বা রইলাম সশরীরে তোমার গৃহে। আমাদের এই

প্রতিমূর্তি তোমায় দিলাম। নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুই প্রতিমূর্তির সেবা করো। এই প্রতিমূর্তির মধ্যেই আমরা থাকবো।

প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ্
প্রতিমূর্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥

প্রবোধ মানলো না গৌরীদাসের মন। প্রতিমূর্তি নিয়ে তিনি কি করবেন? গৌরীদাস চান, সচল জীবন্ত প্রতিমূর্তি।—যে জীবন্ত প্রতিমূর্তি তাঁর সঙ্গে কথা কইবে, চলবে-ফিরবে, খাওয়া-দাওয়া করবে। তিনি চান মহাপ্রভুকে। মহপ্রভুর প্রতিমূর্তি নয়।

কাঁদতেই লাগলেন গৌরীদাস।

প্রভু, আমায় এমন ক'রে ভুলিও না। তুমি যেওনা অন্য কোথাও। এখানেই থাক চিরস্থায়ী হ'য়ে। থাক আমার ভবনে। অম্বিকা কালনায়।

এত শুনি গৌরীদাস ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই প্রবোধ করয়ে তায়,
তমু হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥

হিয়া কিছুতেই স্থির হ'তে চায় না। মহাপ্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন গৌরীদাস।

প্রভু, যেও না। এখানেই থাক। তুমি চ'লে গেলে আমি বাঁচবো না।

গৌরীদাসের আর্তনাদ শুনে মহাপ্রভু এক অলৌকিক কাণ্ড করলেন।

আকুল দেখিয়া তারে কহে গৌর ধীরে ধীরে
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি
রহিলাম এই দুই ভাই ॥

ব্যাপার কি ঘটলো ? দুঃখী নিজে লিখলেন।—

এতেক প্রবোধ দিয়া দুই প্রতিমূর্তি নিয়া
আনি পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারিজনে দাঁড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় ভেল
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥

'চার' জন প্রভু গৌরীদাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'দু'জন সচল বিগ্রহ—মহাপ্রভু স্বয়ং ও প্রভু নিত্যানন্দ। আর দুজন হ'লেন দুই প্রভুব দুই প্রতিমূর্তি।

মহাপ্রভু হেসে বললেন,

পণ্ডিত, এই চার জনের মধ্যে যে দুইজনকে চাও, রেখে দাও নিজেব কাছে তোমার ঘরে। বাখ চিরদিনের মত। কি ? বিশ্বাস হোলো না আমার কথায় ? বেশ ! ভোগ নিবেদন ক'রে দেখ চার জনকেই। দেখ, এই চার জনেই একত্র ব'সে তোমার ভোগ গ্রহণ করে কি না।

স্বয়ং মহাপ্রভুর কথা ! বিশ্বাস না ক'রে গৌরীদাস দাঁড়াবেন কোথায় ?

তক্ষুনি গিয়ে গৌরীদাস নিজে ভোগ রাঁধলেন। সেই ভোগান্ন তিনি চার ঠাকুরকেই নিবেদন করলেন।

পুন প্রভু কহে তারে তোর ইচ্ছা হয় যারে
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীত লাগি তোর ঠাঞি খাব মাগি
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে ॥
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ করিল রন্ধনকাজ
চারিজনে ভোজন করিলা।
পুষ্পমালা বস্ত্র দিয়া তাম্বুলাদি সমর্পিয়া
সর্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা ॥

কী আশ্চর্য ! চার ঠাকুরই গৌরীদাসের নিবেদিত ভোগান্ন একত্র ব'সে গ্রহণ করলেন।

না, এ দৃষ্টিবিভ্রম নয়। গৌরীদাস স্বচক্ষে দেখলেন অত্যাশ্চর্য এই ঘটনা। একবার নয়, দুইবার নয়। বার বার। শুধু কি গৌরীদাস? দেখলেন এই অলৌকিক কাণ্ড সমাগত সকল ভক্তজনই।

সকলেই জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন। গৌরীদাস কেঁদে ফেললেন। দুঃখে নয়। এবার আনন্দে। সৌভাগ্যে।

সেদিন আরও এক রঙ্গ।

মন্দিরে দুই প্রতিমূর্তি রয়েছেন। সেখানেই গিয়েছেন দুই প্রভু—মহাপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দ।

এই অবসরে গৌরীদাস বাইরে থেকে মন্দিরের শিকল দিলেন এঁটে। চার জনেই মন্দিরে আট্‌কা পড়লেন। থাকুন না খানিকক্ষণ।

খুসী মনে বাইরে এলেন গৌরীদাস।

ওঃ হরি! বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহাপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দ। হাসছেন তাঁরা।

এঁ্যা, এই যে এক্ষুনি এঁদের আট্‌কে রেখে এলাম!

বিস্মিত গৌরীদাস দৌড়ে গেলেন মন্দিরে।

সেখানে দুই প্রতিমূর্তি ঠিক দুই প্রভুর মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছেন! মুখে ঠিক ঐ রকমই হাসি! কী মধুর সে হাসির ঝিলিক!

গৌরীদাস আবার দৌড়ে এলেন বাইরে। দুই প্রভু তেমনই হাসছেন। ঠিক তেমনই ভঙ্গিমায়!

এতক্ষণে গৌরীদাসের হুঁশ হোলো। তাঁকে নিয়ে দুই প্রভু কী রঙ্গ-ই না করলেন!

গৌরীদাস ভূমে লুটিয়ে পড়লেন।

ভুল ভাঙলো। সংশয় দূর হোলো। গৌরীদাস বুঝলেন, হ্যাঁ, প্রতিমূর্তির মধ্যেও দুই ঠাকুর রয়েছেন।

যুগল প্রতিমূর্তি ও যুগল প্রভু—গৌর নিতাই—অভিন্ন।

এই রকমে নানাভাবে গৌরীদাসের মনে স্থির বিশ্বাস জাগিয়ে বিগ্রহযুগল গৌরীদাসকে সমর্পণ ক'রে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ নীলাচলে প্রস্থান করলেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে প্রস্থান করবার পূর্বে গৌরীদাসকে কাছে ডেকে আনলেন। যে বৈঠাখানি বেয়ে তিনি অম্বিকা কালনায় গৌরীদাসের ভবনে এসেছিলেন, সেই বৈঠাখানি গৌরীদাসকে দান করলেন।

গৌরীদাস বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

প্রভু, এ বৈঠা নিয়ে আমি কি করবো?

কেন? সবাইকে ভবনদী পার করিয়ে দেবে।—হেসে উত্তর দিলেন ভবনদীর কাণ্ডারী।

এই লেহ বৈঠা, এবে দিলাম তোমারে।
ভবনদী হৈতে পার কর জীবেরে॥

বৈঠাখানি ছাড়া, মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর সম্বলিত একখানি গীতাও সেদিন দান করেছিলেন গৌরীদাসকে।

প্রভু দত্ত গীতা বৈঠা, প্রভু সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে॥

যে তেঁতুল গাছের তলায় মহাপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দ এসে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই তেঁতুল গাছটি এখনও রয়েছে। বৈঠাখানিও রয়েছে দেবমন্দিরে। গীতাখানিও ওখানে রয়েছে।

দিন যায়।

গৌরীদাস মনের আনন্দে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বিগ্রহযুগলের সেবা ক'রে চলেন।

কিন্তু এর মধ্যে এক ভাবনা এসে গেলো মনে।

একজন যোগ্য ভক্তিমান সেবাইত তো চাই। চিরটি কাল তো গৌরীদাস থাকবেন না। তাঁর অবর্তমানে ?

যাই গদাধর পণ্ডিতের কাছে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি।

গদাধর পণ্ডিত।

কে না জানে গদাধরের নাম ?

মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী গদাধর। বড়ই প্রিয়পাত্র। শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণে দৃঢ়মতি। পূর্ব লীলায় গদাধর ছিলেন শ্রীমতী রাধারাণী। তাইতো মহাপ্রভুকে বলা হয় 'গদাধরের প্রাণনাথ'। এই গদাধর পণ্ডিতের ভাই হলেন বাণীনাথ।

হৃদয়চৈতন্য বাণীনাথের পুত্র। কেউ কেউ তাঁকে বলেন হৃদয়ানন্দ।

গৌরীদাস দেখলেন হৃদয়চৈতন্যকে। খুব ভালো লাগলো। বড়ই সুলক্ষণযুক্ত। বড়ই ভক্তিমান। জন্মাবধি মহাপ্রভুর কাছে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই হৃদয়চৈতন্য।

গৌরীদাস গদাধরের শরণাপন্ন হলেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন হৃদয়চৈতন্যকে।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা পূরলো।

গদাধর হৃদয়চৈতন্যকে সঁপে দিলেন গৌরীদাসের হাতে।

গৌরীদাস হৃদয়চৈতন্যকে বসালেন শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মন্দিরে। তাঁকে নিযুক্ত করলেন জাগ্রত বিগ্রহযুগলের সেবাকাজে, পূজা-অর্চনায়।

হৃদয়চৈতন্যও কি কম শক্তিমান ?

তিনিও একজন বরণীয় বৈষ্ণব। মহাভাগবত।

বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা।
মহাভাব-চমৎকার-গৌরভাব-কলেবরম্ ॥

হৃদয়চৈতন্য কালে হলেন কালনার ভক্তসমাজের মধ্যমণি। বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।

একজন মহাবৈষ্ণব ব'লে দেশের সর্বত্র তাঁর নাম প্রচারিত হোলো।

এই হৃদয়চৈতন্য। হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর।

সেদিন সন্ধ্যা হয়েছে। সন্ধ্যারতি সবে শেষ হোলো।

হৃদয়চৈতন্য ভক্তদের নিয়ে যথারীতি মহাপ্রভুর লীলা-আলোচনা করছেন।

এমন সময়ে দুঃখীরাম এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। প্রণাম করেই কেঁদে ফেললেন।

ঠাকুর ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন, বাবা?

প্রভু, বহু দূর থেকে এসেছি। এসেছি একটি মাত্র আশা সম্বল ক'রে। থাকবো এখানে আপনার পায়ের তলে। আপনার কাছেই দীক্ষা নেবো। ধন্য করবো জীবন। প্রভু, এ অধমকে কৃপা করুন।

দুঃখীরাম কাঁদতেই লাগলেন।

দুঃখীরামের সরলতায়, আর্তিতে, দৈন্যে ঠাকুর মুগ্ধ হলেন। তাঁর করুণা হোলো। তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন দুঃখীরামকে। তারপর একটি একটি ক'রে সব কথা জানলেন। দুঃখীরাম কিছুই গোপন করলেন না। জানালেন মা ও বাবার অনুমতি দানের কথাও।

ঠাকুর বুঝলেন সব।—এতটুকু ছেলে! এসেছে এত দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে! না, এ আবেগ নয় শুধু। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি রয়েছে এর ভাগ্যে!

হ্যাঁ, তোমার নামটি তো জিজ্ঞাসা করিনি এখনও।

প্রভু, আমার নাম দুঃখী। দুঃখীরাম।

না, বাবা। তুমি দুঃখী নও। তুমি যে কৃষ্ণদাস। শুধু এ জন্মের নয়, জন্মজন্মান্তরের কৃষ্ণদাস! তোমার পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করতে বলবো না আমি। আজ হ'তে তোমার নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস।

নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমায় দীক্ষা দেবো। দীক্ষা দেবো আজই—এই গৌরবিগ্রহের সম্মুখেই।

বিশ্রাম করো কিছুক্ষণ। তারপরে গঙ্গায় গিয়ে স্নান ক'রে আসবে। আজই দীক্ষা দানের প্রশস্ত দিন। ভালোই হোলো।

দুঃখীরামকে দীক্ষা দিলেন হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর।

এই দিন থেকে দুঃখীরাম হলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস।

আশাতীত কৃপা লাভ করলেন এই উড়িয়া বালকটি। তিনি নীরবে রইলেন। দুই চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

দুঃখে নয়। চোখে জল এলো আনন্দে। এতদিন ধ'রে যা চেয়েছেন, এত সহজে, আসা মাত্র, তা' পেলেন, সেই আনন্দে।

হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের গৃহে গৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের উপর এই বিগ্রহ-যুগলের সেবার ভার পড়লো।

তাঁর আনন্দের আর সীমা নেই। নিজের ভাগ্যে তিনি কৃতার্থ। সারাদিন আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। দেহ মন প্রাণ দিয়ে তিনি বিগ্রহ-যুগলের সেবা করেন। বৈষ্ণবীয় আচার অনুষ্ঠান সবই পালন করেন ত্রুটিহীন নিষ্ঠার সঙ্গে।

বিগ্রহ-যুগলকে প্রত্যহ স্নান করান। স্নান করান গঙ্গাজলে। গঙ্গা বেশ কিছুটা দূরে। দুঃখী কৃষ্ণদাস কলসী নিয়ে গঙ্গায় জল আনতে যান। কলসী ভ'রে জল আনেন মাথায় ক'রে। এ তাঁর নিত্যকার কাজ।

প্রতিদিন এইভাবে জল আনতে আনতে মাথায় তাঁর ঘা হ'য়ে গেল। খানিকটা জায়গা জুড়ে বেশ বড় ঘা।

তা হোক। সে দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নেই। নেই বিন্দুমাত্র কষ্টবোধ। আনন্দে আত্মহারা হয়েই দুঃখী কৃষ্ণদাস বিগ্রহসেবার কাজ করে চলেছেন।

প্রতি দিনকার মত সেদিনও দুঃখী কৃষ্ণদাস ঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

ঠাকুর আশীর্বাদ করলেন তাঁর মাথায় হাত রেখে।

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো দুঃখী কৃষ্ণদাসের মাথায়, ঘায়ের উপর।

এ কী কাণ্ড! কী ক'রে হোলো এত বড় ক্ষত!

শুনলেন সব কথা। পুলকিত হলেন তিনি। মুগ্ধ হলেন। প্রেমে দুঃখী কৃষ্ণদাসকে আলিঙ্গন করলেন। আশীর্বাদ করলেন, গৌর-কৃপা অঝোরে তোমার শিরে বর্ষিত হোক।

ঠাকুর আজ বুঝলেন, দুঃখী কৃষ্ণদাসের সম্মুখে বিরাট সম্ভাবনা। তাঁর সম্মুখে বিশাল কর্মক্ষেত্র প্রসারিত। ভবিষ্যতে এ শিষ্য হবে বৈষ্ণব-জগতের অন্যতম মহা-আচার্য।

ঠাকুর শিষ্যকে কাছে ডেকে নিলেন। সস্নেহে বললেন, বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। কাল-বিলম্ব না ক'রে তুমি বৃন্দাবনে যাও। সেখানে গিয়ে শরণাপন্ন হও শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর। অধ্যয়ন কর তাঁরই নির্দেশমতো বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র। ভবিষ্যতে তোমার মতো আচার্যের বড় প্রয়োজন হবে। তুমি প্রস্তুত হও, বাবা।

দুঃখী কৃষ্ণদাস মর্মাহত হলেন। গুরুদেব এ কী আদেশ করছেন আজ তাঁকে! গুরুদেবকে ছেড়ে যেতে হবে! এ যে মর্মভেদী কথা!

তিনি কাঁদতে লাগলেন।

গুরুদেব, আপনাকে উদ্দেশ্য ক'রেই এ অধম এসেছে সুদূর উড়িষ্যা থেকে! আপনার শ্রীচরণ লাভ করেছে বলে দুঃখী আজ পরম সুখী। আপনার বিরহে এই অভাগার কি নিদারুণ মর্মকষ্ট হবে একবার তা অনুভব করুন।

গুরুর আদেশ নির্বিচারে পালন করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য, বাবা। তুমি কি মনে কর, তোমার মত শিষ্যের বিরহে আমারও কষ্ট হবে না? হবে, বাবা, হবে। তবুও বলছি, তুমি বৃন্দাবনে যাও। তোমার কল্যাণ হবে। লাভবান হবে বৈষ্ণব জগৎ। তুমি আশ্বস্ত

হও। গৌর কৃপা তুমি সর্বক্ষণই লাভ করবে। সব সময়েই থাকবে তোমার রক্ষা-কবচ হ'য়ে।

অত্যন্ত ব্যথিত হলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস। তবু রওনা হলেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। গুরুদেবের আদেশ।

ঠাকুর দুঃখী কৃষ্ণদাসের হাতে শ্রীজীব গোস্বামীকে অনুরোধ ক'রে একখানি পত্র দিয়েছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তখন সমগ্র ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদের মহা-আচার্য, মধ্যমণি।

দুঃখী কৃষ্ণদাস এলেন বৃন্দাবনে।

প্রথমেই তিনি এলেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে। দাস গোস্বামী থাকেন রাধাকুণ্ডে।

রঘুনাথ বললেন, তোমার গুরুদেব তোমাকে যে আদেশ করেছেন, যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই-ই পালন কর, বাবা। তুমি শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর কাছেই যাও। সেখানে গিয়ে তাঁরই নির্দেশমতো শাস্ত্র অধ্যয়ন করো। দৃঢ় করো সাধনার ভিত্তি।

দুঃখী কৃষ্ণদাস বৃথা কালক্ষেপ করলেন না। চ'লে এলেন শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে। তাঁকে প্রণাম ক'রে তিনি হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের অনুরোধ পত্রখানি অর্পণ করলেন।

শ্রীজীব গোস্বামী সাদরে গ্রহণ করলেন দুঃখী কৃষ্ণদাসকে। এখানে থেকেই দুঃখী কৃষ্ণদাস ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। করতে থাকেন সাধন ভজন।

দিন যায়।

দুঃখী কৃষ্ণদাস ক্রমশঃ বৈষ্ণব-সমাজে পরিচিত হ'তে লাগলেন। মর্যাদা পেতে লাগলেন।

তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। সাধন

ভজনও করতে লাগলেন নিজ গুরুদেব হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নির্দেশিত পথে।

এই সময়ে দুঃখী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে আরও দুইজন বৈষ্ণব সাধন-পথে এগিয়ে চলছিলেন। তাঁরা হলেন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুর।

এই তিন জনের মধ্যে প্রীতি ও সৌহৃদ্য গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হ'তে লাগলো। এই প্রীতি ও সৌহৃদ্য অক্ষুণ্ণ ছিলো মৃত্যু পর্যন্ত।

বেশ কিছুদিন পরে এই তিন জনই বৃন্দাবন থেকে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও আরও বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গৌড়ে নিয়ে যাবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে ১৫০৪ শকের কথা। পথে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের রাজ্য মধ্যে সেই সব গ্রন্থ অপহৃত হয়। পরে অবশ্য গ্রন্থগুলি উদ্ধার করা গিয়েছিল। সে আর এক কাহিনী।

দুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তবুও সাধন ভজনে বিঘ্ন ঘটতে দেন না।

এই সময়ে—শুধু এই সময়েই বা কেন, বাল্যকাল থেকেই—দুঃখী কৃষ্ণদাস উপলব্ধি করেন, সেবা-ই ভক্তি-যোগের সার কথা। তাই সেবা কাজেই তিনি বিশেষ তৎপর থাকতেন।

বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ মন্দির।

এই মন্দির ও রাসমণ্ডল ধৌত করবার, মার্জন করবার কাজ নিলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস সাগ্রহে।

বড় আনন্দের সঙ্গে তিনি মন্দির ও প্রাঙ্গণ মার্জন করেন। এ কাজ করেন বারংবার। আহা, এ যে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাস্থলী। এখানে কি কিছু অপবিত্র বস্তু রাখা চলে? এখানে যে শ্রীরাধাগোবিন্দের পুজো হয়। হয় ভোগারতি। পড়ে অগণিত বৈষ্ণব মহাত্মার পদরজঃ। এ স্থান কি অপবিত্র রাখা যায়? বার

বার তাই ধৌত করেন, মার্জন করেন মন্দির, মন্দির-প্রাঙ্গণ। মন্দির নির্মল হয়। শীতল হয়।

গুরুদেব বলেছেন, সেবা কর। সেবা কর। সেবাই তো ভজন। এরই মধ্য দিয়ে হবে তোমার অভীষ্ট প্রাপ্তি।

অনুরণিত হ'য়ে ফেরে প্রতিদিন গুরুদেবের মুখনিঃসৃত এই বাণী।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের অন্তরে তাই আশা জাগে, এই সেবা করতে করতেই একদিন তিনি শ্রীরাধারাণীর চরণ দর্শন করবেন। দর্শন পাবেন শ্রীগোবিন্দের। দর্শন পাবেন যুগলদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের এক সঙ্গে।

সেবা ক'রে চলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। অন্তরে আশা ক্ষীণ হ'তে তীব্র, তীব্র হ'তে তীব্রতর হয়।

কবে দেখবেন সখিগণ-পরিবৃতা শ্রীরাধারাণীকে? কবে দেখবেন শ্রীরাধাগোবিন্দকে?

মন্দিব মার্জনের কাজ আরও উৎসাহের সঙ্গে চলে। আরও বেড়ে ওঠে যুগলদেবতাকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা।

হে রাধাগোবিন্দ, কৃপা কর। কৃপা কর। দেখা দাও। যুগলরূপে একবার সম্মুখে এসে দাঁড়াও।

সেদিন রাত্রি শেষ হ'তে চলেছে।

দুঃখী কৃষ্ণদাস ঘুম থেকে উঠলেন। জল-পাত্র হাতে নিলেন। নিলেন বস্ত্রখণ্ড। শুরু করলেন মন্দির মার্জনের কাজ।

এ কী! অদূরে এ কী দেখা যায়! অস্পষ্ট আলোতেও চক্‌চক্ করছে—এ কী!

এগিয়ে গেলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস।

এ যে একগাছি সোনার নূপুর!

বিচলিত হলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণব হ'য়ে কাঞ্চন স্পর্শ করবেন! কিন্তু এ নূপুর দেখবামাত্র কেন হৃদয় প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে উঠছে! স্পর্শ করবার জন্যে কেন তীব্র ব্যাকুলতা জাগছে!—দেখি!

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে নূপুরখানি উঠিয়ে আনলেন।

নূপুর থেকে যে মধুর গন্ধ নির্গত হচ্ছে! নূপুরেও গন্ধ! এ কী অলৌকিক কাণ্ড!

দুঃখী কৃষ্ণদাস সম্বিৎ হারাতে বসলেন। দেখা দিতে লাগলো একে একে সাত্ত্বিক বিকার।

কেটে গেলো কিছুক্ষণ। ফিরে এলো সম্বিৎ। তিনি স্পষ্টই অনুভব করলেন, এ কোনও প্রাকৃতিক পদার্থ নয়। নিশ্চয়ই এ এক দিব্য বস্তু। দিব্য অঙ্গের দিব্য নূপুর।

আচম্বিতে একটি দশ এগারো বছরের মেয়ে সেখানে আবির্ভূত হোলো। পরমা সুন্দরী। অতুলনীয় রূপ।

কণ্ঠে পৃথিবীর সমুদয় মধু ঢেলে সে বললো,

এ ভাইয়া, একঠো সোনেকা নূপুর তুম্‌কো মিলা হ্যায়?

—ভাই, একখানি সোনার নূপুর পেয়েছো?

এ কে? কোথা থেকে এলো? এমন মধুর রূপ তো দেখিনি কখনও! মধুর কথাও তো এমন শুনি নি! এ কে?

দৃষ্টি ফেরে না। চোখের পলক পড়ে না। আহা!

দুঃখী কৃষ্ণদাস মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েই রইলেন।

এ ভাইয়া, একঠো সোনেকা নূপুর তুম্‌কো মিলা হ্যায়?

এতক্ষণে হুঁশ হোলো। এতক্ষণে কথাটার মর্ম বুঝলেন।

হ্যাঁ। নূপুর একখানি পেয়েছি। এই যে। কার এ নূপুর জানো?

কিশোরী বললো, কাল রাতে আমার সখীর একখানি নূপুর হারিয়ে গিয়েছে। সে এক রাজনন্দিনী। বয়স অল্প। লোকের সামনে বেরুতে তাঁর খুবই সংকোচ। তাই আমাকে পাঠিয়েছে খুঁজতে।

তুমি ঠিক কথা বলছ কিনা কিসে বুঝবো? এক কাজ করো। যাঁর নূপুর তাঁর আসতে হবে না এখানে। আমাকেই বরং সেখানে নিয়ে চলো। তাঁর পায়ে মিলিয়ে দেখবো। যদি মিলে যায়, আমি-ই

নিজের হাতে এই নূপুর তাঁর পায়ে পরিয়ে দিয়ে আসবো। তা নইলে নূপুর তো পাবে না।

কিশোরী চ'লে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে আবার এলো। এবার একা নয়। সঙ্গে আর এক কিশোরী। একখানি সোনার প্রতিমা। সেই রাজনন্দিনী।

নবাগতা কিশোরীর সারা অঙ্গে স্বর্গীয় রূপমাধুরী। দিব্য জ্যোতি। মন্দির, প্রাঙ্গণ, দশ দিক আলোকিত হ'য়ে গেলো সে জ্যোতির বিভায়। দিব্যভাবে পরিপূরিত হোলো দুঃখী কৃষ্ণদাসের সারা অন্তর।

দুই কিশোরী এসে দুঃখী কৃষ্ণদাসের সম্মুখে দাঁড়ালেন।

দুঃখী কৃষ্ণদাস কথা কইবেন কি! নির্বাক হয়ে গেলেন যেন! শুধু অন্তর থেকে নির্গত হোলো, মরি মরি! মরি মরি!

আগের সখী বললেন, এ ভাইয়া, শুন তো!……

এতক্ষণে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস। কোনও মতে আত্মসংবরণ ক'রে তিনি বললেন, রাত্রির শেষ দণ্ডে তোমরা দুই সখী এই মন্দিরে কেন এলে, আমায় বলো। তোমরা কারা? বলো। অকপটে, খোলসা ক'রে সব বলো। আমার যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

রাজনন্দিনী এবার কথা কইলেন। কথা কইলেন না অমিয় ঝরতে লাগলো! মধুবর্ষণ শুরু হোলো!

ম্যঁয় বহুত ক্যা কহুঙ্গি? ইয়ে তো মেরা নিকুঞ্জ-মন্দির হ্যায়। অব্ তুম্ সব্ সমঝ্ লেও। জ্যাদা হট্ না করো। দেখো, সুব্হ হোনেকো আয়া। মেরা নূপুর তো লওটা দো।

বেশী আর কী কইব! এ তো আমারই নিকুঞ্জ মন্দির। এতেই বুঝে নাও সব। বেশী গোল কোরো না। ভোর হ'য়ে এলো ব'লে। দেরী না ক'রে আমার নূপুর ফিরিয়ে দাও।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের চোখ থেকে খুলে যায় আবরণ। মন বুদ্ধি হৃদয় একই সত্য জানতে পারলো—হাঁ, ইনিই শ্রীমতী রাধারাণী। সখী

হলেন ললিতা। হারানো নূপুরের ছল ক'রে রাধারাণী সখী ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে দুঃখী কৃষ্ণদাসকে দর্শন দিলেন।

ওরে কৃষ্ণদাস, যদি দুর্লভ ধন এসেছেই সম্মুখে, তবে তাকা, তাকিয়ে ছাখ্! ছাখ্, পরম আকাঙ্ক্ষিত ধন রাধারাণী আজ দাঁড়িয়েছেন তোরই সম্মুখে! ছাখ্, হতভাগ্য, ছাখ্।

কিন্তু কি ক'রে দেখবে? চোখের জল যে বাধা মানে না! অবরোধ করে দৃষ্টি। চোখ মোছেন। আবার জল আসে। আবার মোছেন। আবার জল। এ কী! কথাও যে মুখ দিয়ে বেরোতে পারছে না!

কষ্টে, অতি কষ্টে, নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে দুঃখী কৃষ্ণদাস বললেন—

যদি এ অধমকে এতই কৃপা করলে, তবে দেখা দাও নিজের স্বরূপে। কৃতার্থ করো আমায়।

রাধারাণী বললেন—

ইন্ আঁখোসে মেরা সত্যরূপ তুম্ ক্যা ছাখ্ সাকোগে?

এই চোখ দিয়ে আমার চিন্ময়-রূপ কি দেখতে পারবে?

কৃপা করো। কৃপা করো। বারেকের তরে দেখাও তোমার স্বরূপ।

নরম হোলো সখী ললিতার মন।

প্যারী জী, জব্ তুম্‌হারি কৃপা হুই হ্যায়, তো থোরি শক্তি ভি দান করো।

—প্যারী জী, যখন এঁর পরে তোমার কৃপা হয়েছেই, তখন এঁকে কিছুটা শক্তিও দান করো।

রাধারাণী মৃদু হাসলেন। সে হাসির লহরীতে দুঃখী কৃষ্ণদাসের সমস্ত সত্তায় আলোড়ন জাগলো। শরীর রোমাঞ্চিত হোলো। অমৃতের তরঙ্গ ব'য়ে গেলো দশ দিকে।

কৃপা করলেন রাধারাণী।

দুঃখী কৃষ্ণদাস তাঁকে দর্শন করলেন। ত্রিভুবন যাঁকে দেখলে কৃতার্থ হয় তাঁকে তিনি দেখলেন। ছদ্মবেশে নয়। স্বরূপে।

দুঃখী কৃষ্ণদাস নির্বাক। চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। তাকিয়েই রইলেন। দৃষ্টি ফেরে না। আহা!

দুঃখী কৃষ্ণদাস সম্বিৎ হারিয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

রাধারাণী বললেন, ওঠো। প্রকৃতিস্থ হও।

দুঃখী কৃষ্ণদাস ধীরে ধীরে উঠে যুক্ত-করে বসলেন।

নূপুর ললাটে ধারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হলো নূপুরাকৃতি তিলক।

তোমার একনিষ্ঠ সেবা আর ঐকান্তিক ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক। আর, আমার কৃপাচিহ্ন হিসেবে ললাটে ধারণ করো এই নূপুর-চিহ্নিত তিলক।

দুঃখী কৃষ্ণদাস জ্ঞানহারা হ'য়ে আবার ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সখী ললিতাকে নিয়ে রাধারাণী অন্তর্ধান করলেন।

ভোর হয়েছে। সূর্যদেব উঠেছেন আকাশে।

ফিরে এসেছে দুঃখী কৃষ্ণদাসের সম্বিৎ।

তিনি ছুটে গেলেন শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ভজন-কুটিরে।

প্রভু!—লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে। চোখে তাঁর জল।

কি হয়েছে, বাবা? কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?

দুঃখী কৃষ্ণদাস কাঁদতে কাঁদতেই নিবেদন করলেন সমুদয় বৃত্তান্ত। দেখালেন ললাটের তিলক।

শ্রীপাদ আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। দুঃখী কৃষ্ণদাসকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন।

ভাগ্যবান, মহাভাগ্যবান তুমি। তুমি কৃপাময়ীর কৃপালাভ করেছো। তাঁকে দর্শন করেছো। তাঁরই শ্রীপদের নূপুর-শোভিত তিলক ললাটে ধারণ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে তোমার। তুমি ধন্য। ধন্য তুমি। আর, তোমাকে স্পর্শ ক'রে আমিও ধন্য।

শ্রীপাদ গোস্বামীর দুই চোখ দিয়ে ফোয়ারার মত জলধারা

ছুটলো। সেই পবিত্র জলধারায় স্নান করলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস। অভিষেক হোলো তাঁর।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বললেন, বৎস, আজ হ'তে তোমার নাম আর দুঃখী কৃষ্ণদাস নয়। নিঃশেষে অপগত হয়েছে তোমার সকল দুঃখ। তুমি শ্যামপ্রিয়া শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা লাভ করেছো। আজ হ'তে তোমার নাম শ্যামানন্দ। আর, আজ হ'তে শ্রীমতী রাধারাণীর নূপুর-চিহ্নিত তিলকই ললাটে ধারণ করো।

জয় হোক রাধারাণীর! জয় হোক রাধারাণীর কৃপাপ্রাপ্ত শ্যামানন্দের!

অচিরে এই অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচারিত হ'য়ে পড়লো সর্বত্র।

কালনায় ব'সে জনৈক ভক্তের মুখে শুনলেন এই ঘটনা হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর। সেই ভক্ত অতিরঞ্জিত ক'রেই তাঁকে বলেছেন। কিছুটা মিথ্যাও বলেছেন।

তিনি বলেছেন, দুঃখী কৃষ্ণদাস আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে অপর একজনকে গুরু করেছে। আপনার দেওয়া নাম ত্যাগ করেছে। ত্যাগ করেছে আপনার প্রদত্ত তিলক।

লীলাময় এক মধুর লীলা ক'রে বসলেন।

তিনি হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটালেন। দিলেন তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রে।

হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর ভুল বুঝলেন। অসন্তুষ্ট হলেন শ্যামানন্দের 'পরে। খুবই ক্রোধ হোলো। তিনি তক্ষুনি একজনকে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে পত্র দিয়ে।—অচিরেই যেন দুঃখী কৃষ্ণদাসকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শ্যামানন্দ এলেন কালনায়। পাদবন্দনা করলেন গুরুদেবের। তাঁর সম্মুখে যুক্ত-করে দাঁড়ালেন।

ঠাকুর আজ বড়ই উত্তেজিত। তিনি রুক্ষস্বরে শ্যামানন্দকে

বললেন, জবাব দাও, গুরুদত্ত নাম কেন ত্যাগ করেছো? কেন ত্যাগ করেছো চিরাচরিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিলক? কিসে হ'ল এত সাহস তোমার? স্পর্ধা?

শ্যামানন্দ বিনীতভাবে উত্তর করলেন, সে সব-তো আপনারই কৃপায় সম্ভব হয়েছে, প্রভু! অপার আপনার কৃপা। আমার সৌভাগ্যের সীমা নেই।

প্রশমিত হোলো না ঠাকুরের ক্রোধ।

বেশ! আমি-ই যদি তোমার সব পরিবর্তনের নিমিত্ত হ'য়ে থাকি, তবে আমি-ই পুনরায় আদেশ করছি, ত্যাগ করো নূতন নাম। পরিবর্তন করো তিলক।

এই নূতন তিলক আমি আপনার কৃপাতেই লাভ করেছি, প্রভু। এ তিলক যদি পরিবর্তন করাতে চান, তবে আপনিই—আমার গুরুদেব আপনিই, তা করুন। আপনিই নিজ হাতে মুছে দিন এই তিলক। —শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন শ্যামানন্দ।

বেশ! তাই-ই করছি!

ঠাকুর তক্ষুনি একখানি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে শ্যামানন্দের ললাট-তিলক মুছতে লাগলেন।

কিন্তু তিলক ওঠে না। মোছে না। যত মোছেন কাপড় দিয়ে, তিলক তত উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। বারবার চেষ্টা করলেন ঠাকুর। তাঁর যেন জিদ চেপেছে। কিসে যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে। সবলে কাপড় দিয়ে ঘষতে লাগলেন কপালের তিলক। পারলেন না। শ্যামানন্দের ললাটের তিলক—ব্রজের রজোলিপ্ত নূপুর-চিহ্নিত তিলক জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

এতক্ষণে ঠাকুরের ভুল ভাঙলো।

না, বৎস। আমি-ই ভুল করেছি। মহাভুল করেছি। অন্যায় করেছি। নূপুর-চিহ্নিত তিলকই তোমার ললাট-ভূষণ হোক। পরিচিত হও তুমি শ্যামানন্দ নামেই। ভাগ্যবান তুমি।

আর বৎস, আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছি। ক্রোধকে দমন করতে পারি নি। যা বৈষ্ণবের কিছুতেই করা উচিত নয়, তা-ই করেছি। সবচেয়ে বড় কথা, আমার এমন স্পর্ধা হয়েছিল, স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাচিহ্ন আমি পরিবর্তন করতে দুঃসাহসী হয়েছিলাম! বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি যাঁর নামকরণ করেন, সে নাম ত্যাগ করতে বলেছিলাম! মহা অন্যায় করেছি আমি!

তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রুর প্রবাহ ছুটলো।

শ্যামানন্দ লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুরের পায়ে। চোখের জলে তাঁর দুই পা ধুইয়ে দিলেন।

না, প্রভু, না। এ জাতীয় কথা বারেকও আর উচ্চারণ করলে আমি গঙ্গায় ডুবে প্রাণ বিসর্জন দেবো।

বৃন্দাবন হ'তে আনীত রাধাগোবিন্দজীর এক জাগ্রত বিগ্রহ হৃদয়-চৈতন্যের কাছে ছিল। আনন্দে তাঁরই সেবাভার তিনি শ্যামানন্দকে অর্পণ করলেন।

শ্যামানন্দ কিছুকাল কালনায় রইলেন।

পরে কয়েক বৎসর আবার গিয়ে বৃন্দাবনে বাস করলেন।

শেষ জীবনে শ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার নৃসিংহপুর গ্রামে অবস্থান ক'রে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করেন। তিনি বহু মুসলমানকেও শিষ্য করেছিলেন। শের খাঁ এঁর শিষ্য ছিলেন। পরবর্তী কালে এঁর নাম হয় শ্রীচৈতন্যদাস।

শ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। এখানকার মঠ থেকেই তিনি অসংখ্য ভক্তজনকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

সাধক কমলাকান্ত

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।

মন, তুই ছাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।...

কী সুন্দর গান। এই মধুর গানটি প্রায়-ই এখানে ওখানে গাইতে শোনা যায়। কত মহাসাধক গেয়েছেন ভাবে বিভোর হ'য়ে এই গানটি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাক্ষ্যাপা—এঁরা এই গানটি প্রায়ই গাইতেন।

কে লিখেছেন এই গান?

লিখেছেন মহাসাধক কমলাকান্ত।

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
(শ্যামাপদ নীলকমলে, কালীপদ নীলকমলে)
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'লো কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেলো,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে আশাপূর্ণ এত দিনে
(তায়) সুখ দুঃখ সমান হ'ল আনন্দ সাগর উথলে॥

মধুমত্ত ভ্রমরের মতো মায়ের চরণ-সরোজ মধু পান ক'রে কে ব'লে উঠেছেন এই কথা? প্রশান্ত পরমানন্দের স্তরে এসে কে গেয়েছেন এই গান?

গেয়েছেন সাধক কবি কমলাকান্ত। হ্যাঁ, কমলাকান্তই তো এই গানটি লিখে, গেয়ে শত শত সাধকের প্রাণে ভাবের তরঙ্গ তুলেছেন।

এই অপূর্ব গানটির রচয়িতাও কবি কমলাকান্ত।—

শুক্‌নো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে।...

ভাবঘন এই গানটিও লিখেছেন কমলাকান্ত।

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা' ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন ঐ পরশ মণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥

এই জাতীয় কত সুন্দর, মধুর গান লিখেছেন কমলাকান্ত, সাধক কমলাকান্ত।

কমলাকান্ত কেবল কবি ছিলেন না, সাধক ছিলেন না। তিনি একজন বড় গায়কও ছিলেন।

কবি, গায়ক, সাধক—সবই কমলাকান্তের জীবন-সত্তায় ওতপ্রোত হ'য়ে গিয়েছিল। তাই তো যে শুনতো তাঁর মুখে তাঁরই লেখা গান, সেই-ই মুগ্ধ হোতো। গান গাইতেন, দুই চোখ দিয়ে ধারায় ধারায় জল গড়িয়ে পড়তো। যে শুনতো এই সব গান, তাঁর দুই চোখ দিয়েও অঝোরে জল গড়াতো। তন্ময় হ'য়ে শুনতো গান। এমন কি দুর্ধর্ষ ডাকাতরাও। যে ডাকাতের দল তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে তাঁকে হত্যা করতে খড়্গ উঠিয়েছে—তারাও। গান শুনলো। খড়্গ নামিয়ে নিলো। হত্যা করলো না। হ'য়ে পড়লো অনুগত ভক্ত।

হ্যাঁ, সত্যিই ঘটেছিল এই ঘটনা। ঘটেছিল এই কমলাকান্তকে কেন্দ্র ক'রেই।

পূজো এসে পড়েছে। দুর্গাপূজো।

কমলাকান্ত শিষ্যবাড়ী থেকে ফিরছেন দশ বারোখানা গোরুর গাড়ীতে পূজোর জিনিসপত্র নিয়ে। যাবেন চান্না গ্রামে। চান্না বর্ধমান জেলায়।

চান্নায় ও তার আশেপাশে সে সময়ে ডাকাতদের বড়ই উৎপাত ছিল। এই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত ছিল খুবই ভয়ের ব্যাপার।

চান্নার কথা উঠলেই লোকে বলতো, যদি গেল চান্না, ঘরে উঠলো কান্না।

তখন বিকেল। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো ব লে। সামনেই ওড়গ্রামের বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা।

হঠাৎ কমলাকান্তের কানে এলো - হারে রে রে।

কমলাকান্ত বুঝলেন, ডাকাত পড়েছে।

হাঁক শুনেই গাড়োয়ানরা যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেলো।

সর্দার এগিয়ে এলো। সঙ্গীদের হুকুম দিলো, গাড়ীর সব জিনিসপত্র নামিয়ে নে।

কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করলো,

কোথায় যাচ্ছিলে?

যাচ্ছিলাম? যাচ্ছিলাম চান্না গাঁয়ে। সেখানেই আমার বাড়ী।

চান্নায় বাড়ী? কি নাম তোমার?

কমলাকান্ত শর্মা। সবাই বলে ঠাকুর মশাই।

তা হ'লে তো মুশ্‌কিলেই ফেললে, ঠাকুর। কাছেই থাকো। বাড়ী গিয়ে আমাদের কথা বলবে সবাইকে। হয়তো আমাদের দু'একজনকে চিনেও ফেলেছো। নামও দু'একজনের জানতে পারো। বাধ্য হ'য়ে তোমাকে মেরেই ফেলতে হ'ল দেখছি। নাও, তৈরী হও।

কি জান, বাবা, মরবার জন্যে আমি সব সময়েই তৈরী থাকি। তৈরী-ই আছি। আমাকে নিয়ে তোমাদের যা ইচ্ছে তা-ই করো। তবে একটা কথা। রাখবে? মায়ের নাম করি সর্বদাই। একটা গান গাইতে দাও। গান গাওয়া হ'য়ে গেলে, আমাকে মেরেই ফেলো।

বেশ তো। গানটা গেয়েই নাও।

লাঠি, বল্লম, রাম দা, এই সব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ডাকাতেরা।

কমলাকান্ত গান ধরলেন।—

ও ত্রিনয়না, কেমন তোর করুণা,
আমায় দিয়ে জানা গেল গো এবার।

আত্মপুণ্যে নর, যদি হয় উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে।
এ মা পুণ্যপথে যেতে যেতে :—
আমি হীনভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি, শক্তি হোলো না তোমার ॥
গর্ভবাসে ছিল বাসনা বৈরাগ্য
ভব-বাসে এসে হোলো উপসর্গ,
মা, তোমার চরণে দিতে পাদ্য অর্ঘ্য,—
বাসনা ছিল গো মনে :—
ভজ্‌ব কি ভক্তি না দিলে, মজ্‌ব কি মজালে কালে,
পূজ্‌ব কি মা বিল্বদলে, হোলো রিপুগণ বাদী অনিবার ॥
শিব আজ্ঞায় স্থির ছিলেন এ অবধি,
শিব যদি মা এখন হলেন মিথ্যাবাদী,
শিবের দোহাই দিয়ে মিছে তোমায় সাধি,
মিছে কাঁদি দুর্গা বলে :—
ইহকাল গেল অসুখে, বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্মবিপাকে কলুষ পাতকী না হোলো উদ্ধার ॥

কমলাকান্ত গাইছিলেন। দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। ডাকাতরা কেমন যেন হ'য়ে পড়লো।

তারা বলাবলি করতে লাগলো, কী সুন্দর গান! নিশ্চয়ই ইনি একজন বড় সাধু পুরুষ হবেন।

তাদের মনে কিছুটা অনুতাপ এলো। আমরা শেষে সাধুর সর্বস্ব লুঠ করলাম।

সর্দার অনুরোধ করলো, ঠাকুর, গাও না আর একটা গান।

কমলাকান্ত গাইলেন—

আর কিছুই নাই শ্যামা মা তোর,
কেবল দুটি চরণ রাঙা।

শুনি তা-ও নিয়েছে ত্রিপুরারি
দেখে হলাম সাহস ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা
সুখের সময় সবাই তারা।
বিপদকালে কোথা নাই—
ঘর বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে রাখ,
করুণা নয়নে দেখ,
নইলে জপ করে হে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা,
মা-কে বলি মনের ব্যথা।
আমার জপের মালা ঝুলির কাঁথা
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥

গান শুনে ডাকাতরা মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। তাদের প্রাণ কেমন যেন আন্‌চান্‌ ক'রে উঠলো।

সর্দার বললো, ঠাকুর মশাই, বড় ভালো লেগেছে তোমার গান। খুবই খুসী হয়েছি। তোমার এই সব জিনিসের মধ্যে যা যা তুমি চাও, তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে নিতে পার। বল কি কি চাও। আমরা এক্ষুনি তা ফিরিয়ে দিচ্ছি।

কমলাকান্ত মৃদু হেসে বললেন, যা নিয়েছো, তার কিছুই আমার নয়, বাবারা। ও-সবই অন্য লোকে দিয়েছে। আজ অন্যে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ী গেলে অন্যেই নিতো। আর তিন দিন বাদে মায়ের পূজো। পূজোয় যারা আসতো, তারাই ওই সব নিতো, খেতো। আমার হাতে মাত্র দু' তিন দিনের জন্যেই ওগুলো থাকতো। তাইতেই ও-সবের পরে একটা 'আমার' বুদ্ধি। পরের জিনিস পরের হাতে নিয়ে দুদিনের জন্যে মালিক হওয়া! তোমরা যা সব নিয়েছো, সেই

সবের মালিক এখন তোমরা। তাই আমি তার কিছুই চাইনে। এ জগতে আমার যে 'ধন' আছে, তা' আমারই আছে। তা ইহকালে থাকবে, পরকালেও থাকবে। সে ধন জ্ঞাতিরা ভাগ করে নিতে পারে না। চোরে তা চুরি করতে পারে না। ডাকাতেও তা' পারে না লুঠ করতে। সেই ধনে ধনী ব'লে অশান্তি আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। নিরানন্দ আমায় দেখে দূরে পালিয়ে যায়। সেই ধনে আকৃষ্ট হ'য়ে সবাই আমার কাছে আসে, আমায় ভালবাসে।

সর্দার বিস্মিত হোলো।

ঠাকুর মশাই, আপনার সে 'ধন' কোথায় আছে? নাম কি সে 'ধনের'?

তা কোথায় আছে? তা আছে আমার অন্তরে—অন্তরের অন্তস্থলে। নাম তার কালীনাম মহামন্ত্র।

কমলাকান্ত গান ধরলেন।—

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে।
ধ্যান কালী জ্ঞান কালী প্রাণ কালী আমার রে॥
আসিয়ে ভুবনে এ তনু ধারণে যাতনা না হয় কার রে।
(একবার) হেরিলে ও কায়, সব দুঃখ যায়, এইগুণ শ্যামা মার রে॥
এ ভবে এসেছে, কেহ সুখে আছে, পেয়ে শিরে রাজ্যভার রে।
(আমার) দরিদ্রের ধন, ও রাঙা চরণ, গলায় করেছি হার রে॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, যাওয়া আসা বারংবার রে।
(মায়ের) অভয় চরণ, লহরে শরণ, অনায়াসে পাবি পার রে॥

গান শেষ হোলো। কমলাকান্তের চোখ দিয়ে জল ঝরছিল ধারায় ধারায়। তিনি তখন আর এক জগতে।

সর্দারের চোখেও জল এলো। জল এলো অন্য ডাকতদের চোখেও। তারা সবাই ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

কমলাকান্ত চুপ ক'রে রইলেন। স্থির, প্রশান্ত মূর্তি। সে মুখে

স্বর্গীয় দীপ্তি। সে মুখে নেই দুঃখের লেশ। নেই ক্রোধের আভাষ। সে মুখে শুধু আনন্দের আভা। পবিত্রতার প্রশান্তি।

ডাকাতরা এ-হেন মুখ জীবনে দেখে নি।

সর্দার কাঁদতে কাঁদতেই বললো, ঠাকুর মশাই, আমরা অধম, দুর্বৃত্ত, ডাকাত। আপনি ভক্ত। আপনি সাধু। আপনি মায়ের খাঁটি সন্তান। আপনি আমাদের সব অপরাধ, সব পাপ ক্ষমা করুন। আমরা সবাই আপনার চরণে শরণ নিলাম। মহাপাতকী আমরা। কৃপা ক'রে আমাদের উদ্ধার করুন।

সর্দার কমলাকান্তের পায়ে পড়লো। অন্য ডাকাতরাও।

কমলাকান্ত একে একে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কমলাকান্তের পুণ্য পরশে নিমেষে ডাকাতদের মনে এলো পরম শান্তি।

ডাকাতদের নিয়ে কমলাকান্ত এলেন নিজের বাড়ী। পুজোর কয় দিন রাখলেন তাদের। রাখলেন বাড়ীর ছেলের মতই আপন ক'রে।

ডাকাতরা পুজোয় যোগ দিলো। মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলো। মহা আনন্দে, শান্তিতে তারা কাটালো কয়দিন এখানে।

তারা আর জীবনে ডাকাতি করে নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা কমলাকান্তের ভক্ত হয়েই রইলো। রইলো শিষ্য হ'য়ে।

কে এই কমলাকান্ত? শক্তিমান এই মহাসাধক কে?

শ্যামা মায়ের আদরের দুলাল কমলাকান্ত—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তন্ত্রমতে সাধনা ক'রে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

কমলাকান্তের জন্ম অম্বিকা কালনায়। অনুমান করি, জন্ম হয় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য। মহেশ্বর ছিলেন বড়ই দরিদ্র।

অল্প বয়সেই কমলাকান্ত চ'লে আসেন মামাবাড়ী চান্নায়। চান্না খানা জংশন হ'তে মাত্র দেড় ক্রোশ উত্তরে।

বাল্যে কমলাকান্ত টোলে লেখাপড়া শিখলেন। মেধা ছিল খুব

গাইতেও পারতেন ভালো। ছেলে বয়সে গাইতেন রামপ্রসাদী গান। —মায়ের গান।

উপনয়ন হোলো কমলাকান্তের। সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবে এলো পরিবর্তন। এখন থেকে সুযোগ পেলেই তিনি চ'লে আসেন বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে। কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর। গান করেন। মায়ের ধ্যান করেন।

কমলাকান্তের বৈরাগ্য দিন দিন বেড়েই চলে। উপায়ান্তর না দেখে মা কমলাকান্তের বিয়ে দিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রী গত হলেন। অবশ্য কমলাকান্ত পুনরায় বিবাহ করেছিলেন। সে কিছুদিন পরে।

চান্নার পাশেই খড়গেশ্বরীর মন্দির। এর পাশেই শ্মশান। এই শ্মশানেই সেদিন স্ত্রীকে দাহ করছেন। স্ত্রীর দেহ-অস্থি ভস্মে পরিণত হচ্ছে। তা দেখে কমলাকান্ত সেখানে বসে বসে গাইলেন—

কালি! সব ঘুচালি ল্যাঠা,
এখন, শিবের বচন আছে যাহা,
মানবি কি না মানবি সেটা।
যার প্রতি তোমার কৃপা হয় মা,
তার সৃষ্টি-ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন মেলে না,
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে ভালবাসিস,
তুচ্ছ করিস্ মণি-কোঠা,
আপনি যেমন, ঠাকুর তেমন,
ঘুচলো না তাই সিদ্ধি ঘোঁটা।
এ সংসারে এনে এবার, করলি আমায় লোহাপেটা।
তবু যে মা বলে ডাকি, সাবাস্ আমার বুকের পাটা।
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে কমলাকান্ত কালীর বেটা।
কিন্তু মায়ে পোয়ে এমন ব্যাভার, ইহার মর্ম বুঝবে কেটা॥

চিতার আগুনে জল ঢেলে কমলাকান্ত এলেন ঘরে ফিরে। স্থির করলেন, না, আর সংসারে আবদ্ধ থাকা নয়। মা বাদ সাধেন।

ওরে কি ক'রে সংসার চলবে? আমরা কি না খেয়ে মারা যাবো?

কমলাকান্ত মা নামে পাগল। তাঁকে আট্‌কে রাখবে কে?

সেবার চান্নার কাছে শুধ্‌ড়ে গ্রামে জাকজমক ক'রে কালী পুজো হোলো। কমলাকান্ত গেলেন সেই পূজো দেখতে। কেনারামও আছেন সেখানে। কেনারাম চট্টোপাধ্যায়।

কমলাকান্ত জানেন, কেনারাম একজন বড় তান্ত্রিক সাধক। বাড়ী তাঁর অমরার গড়—মানকরের কাছে। সেখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠিত। সেখানে শ্যামা মা-র বিগ্রহ। সেখানেই কেনারাম সাধনা করেন। তিনি ভালো শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতে ও গাইতে পারতেন।

কেনারামের এই বিখ্যাত গানটি অনেকেরই জানা।—

বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা॥
সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে,
(ওমা) তাই বহিতেছি শিরে সুখ দুঃখেরি পসরা॥
তুমি মা দীন-তারিণী, শরণাগত-পালিনী,
আমি ঘোর পাতকী ব'লে তোমায় হয়েছি হারা॥
আমি মা তোমার পোষা পাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি।
(ও মা) শিখায়েছ তারা বুলি তাই ডাকি মা তারা তারা॥

এই কেনারামের কাছে কমলাকান্ত দীক্ষা নিলেন।

কেনারাম বললেন, ঘর-সংসার ত্যাগ করবার কোনও প্রয়োজন নেই, বাবা। সংসার বন্ধন, মায়ার বন্ধন ধীরে ধীরেই কাটাতে হয়।

কমলাকান্ত গৃহে থেকেই সাধনা শুরু করলেন। তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করলেন। চতুষ্পাঠী খুললেন। সংসার তো চালাতে হবে।

কেটে গেলো আট দশ বছর।

এই সময়ে তাঁর মায়ের 'পরে টান তীব্রতর হয়। সারা রাত সাধন ভজনে কাটান। কাটান বিশালাক্ষীর মন্দিরে।

বিশালাক্ষী মন্দির চান্নার উত্তরে খড়িয়া নামে একটা খালের দক্ষিণে। বিশালাক্ষী মন্দির এখনও আছে।

কোনও দেব দেবীর প্রতিমা নেই এখানে। পাঁচটি অস্বাভাবিক মুণ্ড আসনের উপরে স্থাপিত আছে। প্রাকৃতিক কোনও প্রাণীর মুখের সঙ্গে এদের মিল নেই। মুণ্ডগুলি দেখলেই যেন ভয় জাগে মনে। মন্দিরের পাশেই কমলাকান্ত পঞ্চমুণ্ডীর আসন পাতলেন। কমলাকান্তেব আগে অনেক মহাপুরুষ এই আসনে সাধনা ক'বে গিয়েছেন। তাঁর পরে আর কোনও মহাপুরুষের সাধনাব কথা শোনা যায়নি। তাই এর নাম কমলাকান্তের আসন।

কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক অবধূত মহাপুরুষ বিশালাক্ষী মন্দিবে সাধনা কবতে এসেছিলেন। তিনি কমলাকান্তের শুদ্ধ সত্ত্বগুণময় আধার দেখে মুগ্ধ হলেন। তাঁকে কৌলাচাবে দীক্ষিত করলেন। তাঁবই কৃপায় অল্প সময়ের মধ্যে কমলাকান্ত সাধনায় সিদ্ধ হলেন।

কালিকানন্দ একদিকে যেমন মায়ের পাদপদ্মে অনন্যভক্ত ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি যোগের কৌশলে সমাধি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। কমলাকান্ত এঁর কাছ থেকে নানা যৌগিক প্রক্রিয়াও শিখেছিলেন।

একদিন ভোরবেলায় কমলাকান্তকে ঘরে দেখতে না পেয়ে সবাই তাঁর খোঁজে বেরুলেন। তাঁরা দেখলেন, কমলাকান্ত মরার মতো পুকুরের জলে ভেসে রয়েছেন। ঠাকুর মশাই জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন নাকি? বহু লোক এসে জড়ো হলেন। দেহ পুকুর থেকে তোলা হোলো। সেখানে এক যোগীপুরুষ এলেন তক্ষুনি। তিনি কমলাকান্তকে দেখে বললেন, না না, মৃত নয়। ইনি সমাধিমগ্ন। তিনি কমলাকান্তের সমাধি ভাঙ্গলেন।

কমলাকান্ত মাঝে মাঝে শ্মশানে গিয়েও সাধনা করতে লাগলেন।

সেখানেই মাঝে মাঝে সারা রাত থাকতেন। আশেপাশের লোকেরা কমলাকান্তের মা মা ডাক প্রায়ই শুনতেন।

কমলাকান্ত মা-র দর্শন পাবার জন্যে বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। ঘরে স্ত্রী ও কন্যা রয়েছেন। এদিকে সংসার আর চলে না। তাঁর সেদিকে আদৌ খেয়াল নেই। রাতের পর রাত কেটে যায় বিশালাক্ষীর মন্দিরে।

কমলাকান্ত গান করেন।—

নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতোর হাসি লোকাচার॥
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জ'টে তা দিয়েছে রটে,
আমরা তো সেই জ'টের মুটে হয়েছি আর হব কার॥
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরই বচন সার॥

সেদিন কমলাকান্তের স্ত্রী মহাবিপদে পড়েছেন। ঘরে কিছুই নেই। না চাল ডাল তরি-তরকারী, না টাকা পয়সা।

গৃহিণী মহাভাবনায় পড়লেন। কি করবেন?

অকস্মাৎ নারীকণ্ঠ কানে এলো।

ভট্চাজ মশাই বাড়ী আছেন? দোর খুলুন।

গৃহিণী দুয়ার খুললেন।

শ্যামবর্ণের এক কিশোরী এলেন।

রূপের কি তুলনা আছে? শ্যামবর্ণেও এত রূপ! আহা!

কিশোরীর সঙ্গে দুইজন পরিচারক। তাদের মাথায় দুই চাঙ্গাড়ি খাবার—প্রচুর জিনিস।

এসব তুলে নাও গো। মা তোমাদের জন্যে সিধে পাঠালেন নাও, তুলে নাও।

এত জিনিস!—গৃহিণী অবাক!

বিস্ময়ের রেশ কাটার আগেই লোক দুজন চ'লে গেলো। চ'লে গেলেন কিশোরী।

এঁরা কারা? এঁদের তো কখনও দেখি নি। আর, কেন-ই বা এত খাবার পাঠালো? কিছুই তো বুঝতে পারছি নে!

গভীর রাতে কমলাকান্ত গৃহে ফিরলেন। শুনলেন সব বৃত্তান্ত। তিনিও অবাক হ'য়ে গিয়েছেন।

গৃহিণী বললেন, মেয়েটির কোনও পরিচয় জানতে পারলুম না। কে পাঠালো, কেন পাঠালো তা-ও বুঝতে পারছিনে। মেয়েটি শুধু বললো, মা পাঠিয়েছেন।

ওগো, কে এই মা? বল না। বল না, কে এই মা?

কমলাকান্ত এতক্ষণে বুঝেছেন সব। তিনি কেঁদে আকুল!

কে এই মা?—এ মা তোমার মা, আমার মা, সারা জগতের সবাকার মা। তুমি ভাগ্যবতী। ওগো, বুঝতে পারছো না, জগৎজননী আজ জগৎ-পালিনী হ'য়ে এসেছেন এই দীনের কুটিরে। এসেছেন আমাদের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে। অভাবের জন্যে হাহুতাশ করছিলে তুমি, তাই তোমার অভাব মেটাতে এসেছেন। তোমার ভাগ্যের তুলনা নেই। স্বরূপে না দেখলেও, ছদ্মবেশেও তো তাঁকে দেখতে পেলে! দেখতে পেলে কৃপাময়ী জগদম্বাকে!

কমলাকান্তের সে কী কান্না! মা মা!

দেখাদেখি গৃহিণীও কাঁদতে লাগলেন। মা মা!

দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

অশ্রুসজলকণ্ঠে কমলাকান্ত গাইলেন।—

মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে॥
সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহরা,
এই মিনতি করি তারা, ঐ পদে যেন মতি থাকে॥

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কমলাকান্ত কাটান বিশালাক্ষীর মন্দিরে।

এখন তিনি একেবারে কপর্দকহীন। অথচ দেবীর পুজো তিনি ক'রেই চলেছেন।

দেবীর সেবায় একটি প্রথা বহুদিন যাবত চ'লে আসছে। রাতে মাছ রেঁধে দেবীকে ভোগ নিবেদন করতে হবে।

সেদিন মাছ আর জুটলো না।

তাইতো মাছ পেলাম না।

সাধনপীঠে ব'সে কমলাকান্ত দুঃখ করছেন। কী আর করবেন। গানই ধরলেন। মায়ের গান।

হঠাৎ মনে হোলো, পিছনে পুকুরে কে যেন জাল ফেলছে।

কমলাকান্ত সেইদিক লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—

ওখানে কে গো? এই দারুণ শীতের মধ্যে এত রাত্রে কে তুমি পুকুরে নেমেছো?

আমি নারী বাগদী। মাছ ধরছি।

যদি পাও আমায় কিছু দিয়ে যেও গো। মায়ের ভোগ এখনও দেওয়া হয় নি।

কিছুক্ষণ পরে বাগদী মেয়েটি এলো। হাতে তার এক জোড়া মাগুর মাছ আর একটি শোল মাছ।

প্রদীপের আলোয় দেখলেন, মেয়েটির রূপের সীমা নেই। রঙ কালো। তা হোক্। তার দেহ থেকে এক অপূর্ব মনোহর নীল জ্যোতি বেরুচ্ছে। সেই জ্যোতিতে প্রদীপের আলো ম্লান হ'য়ে গেলো। শুধু কি তাই? জ্যোতির্ময় কালো কান্তিতে যেন রাতের আঁধারও ঘুচে গেলো। আশপাশের গাছপালাও যেন নীল দেখাতে লাগলো। নারী বাগদীর রূপ দেখে কমলাকান্ত মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। এত রূপও মানুষের হয়! আবার এ-ও চিন্তায় এলো। বাগদীদের ঘরে এত রূপবতী তো দেখি নি কখনও! আর, যদি থাকেও,

মেয়েটির সাহস তো কম নয়! এই গভীর রাতে ভয়ঙ্কর নির্জন এই জায়গায় এই দুঃসাহসিনী যুবতী একা এলো! তাইতো!

কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি একাই এয়েছো? তোমার কি ভয়-ডরও নেই?

মধুর কণ্ঠে মেয়েটি বললো, আমি চিরকাল একাই আসি। তা ছাড়া তুমি তো এখানে আছ। তবে আর আসতে ভয় কি! আর, আমি তো সব সময়েই এখানে আসি যাই। এসে তোমার গান শুনি। তোমার গান আমার খুব ভালো লাগে।

তুমি সব সময়েই এখানে আস? এসে আমার গান শোনো? কৈ, আমি তো তোমাকে একবারও দেখিনি? তুমি আমাকে চেনো?

চিনি বই কি! তোমাকে আবার কে না চেনে! তুমি যখন মা মা ব'লে ডাক, মা মা ব'লে গান গাও, তখন আমাব মন পাগলের মত হ'য়ে এখানে ছুটে আসে।

না। আমি তোমাকে চিনতেই পারলুম না।

যদি না-ই পাবলে. আজ ভাল ক'বে চিনে রাখ। পরে আর ভুল হবে না। এখন আমি যাই।

মেয়েটি চললো।

কমলাকান্ত মেয়েটির পিছনে পিছনে যেতে ইচ্ছে করলেন। কিন্তু সংকোচ এসে গেলো। পারলেন না।

মেয়েটি ফিরে বললো, কোথা যাও?

মাছের দাম তো দেওয়া হোলো না।

কাল দিও।

মেয়েটি চলে গেলো।

সেই ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় যত দূর দেখা যায় কমলাকান্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়েই রইলেন।

মেয়েটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

কমলাকান্তের সকল শরীর এই দারুণ শীতেও ঘামে ভিজে গেলো। তিনি মেয়েটিকে আবার দেখবার জন্তে ব্যাকুল হলেন।

নারী বাগদী, নারী বাগদী—চেঁচিয়ে ডাকলেন কমলাকান্ত।

সাড়া মিললো না।

পরদিন ভোরে কমলাকান্ত মাছের দাম দিতে বাগদী পাড়ায় গেলেন। কিন্তু কোথাও সেই মেয়েটির সাক্ষাৎ পেলেন না।

বাগদীরা বললো, ঐ পুকুরে দিনের বেলায় যেতেও আমাদের ভয় হয়। আর, রাত্রিবেলা যুবতী কুলবধূ মাছ ধরতে যাবে? তা ছাড়াও, আমাদের ঘরের কোনও কুলবধূ মাছ ধরে না।

এতক্ষণে কমলাকান্তের হুঁশ হোলো। তিনি সব বুঝতে পারলেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে এতক্ষণে ফোয়ারার মতো জলধারা ছুটলো।

কমলাকান্ত কাঁদতে লাগলেন।

ওরে, কমলাকান্ত! কাঁদিস্ নে। নৃত্য কর। আনন্দে নৃত্য কর। তোর কাছে মা এসেছিলেন! মা এসেছিলেন।

হাসতে চান। চোখের জল বাধা মানে না। আনন্দে হাসতে গিয়ে আরও চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন কমলাকান্ত। মা মা মা।

একটু প্রকৃতিস্থ হ'লে কমলাকান্ত গান ধরলেন।—

শ্যামা মা কি আমার কালো রে।
লোকে বলে কালী কালো, আমার মন তো বলে না কালোরে॥
কখনও শ্বেত কখনও পীত কখনও নীল লোহিতরে।
(আমি) আগে নাহি জানি কেমন জননী, ভাবিয়ে জনম গেলরে॥
কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি, কখনও শূন্যরূপারে।
(মায়ের) এ ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত সহজে পাগল হ'ল রে॥

কমলাকান্তের সঙ্গে মায়ের এমনি ধারা কত গোপন লীলা চলতে লাগলো! মায়ে পোয়ে কত রঙ্গরস।

পঞ্চমুণ্ডীর আসনে কমলাকান্ত ব'সে আছেন সেদিন। একা একা

জবা ফুলের মালা গাঁথছেন আর মায়ের বেদীতে নিবেদন করছেন। সেই সঙ্গে গান। মান অভিমানের পালা।

জানি জানি গো জননী,
যেমন পাষাণের মেয়ে!
আমারই অন্তরে থাক মা,
আমারে লুকায়ে!
প্রকাশি আপন মায়া
সৃজিলে অনেক কায়া,
বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া
ত্রিগুণ দিয়ে।
কার প্রতি দুর্মতি,
কুমতি হও মা কারো প্রতি,
আপনারো দোষে ঢাকো
কারো দোষ দিয়ে।
মা, না করি নির্বাণে আশ,
না চাহি স্বর্গবাস,
নিরখি নয়ন দুটি
হৃদয়ে রাখিয়ে।

গান গাওয়া হ'য়ে গেলে কমলাকান্ত ধ্যানে বসলেন।

কে একজন ব'লে উঠলেন, বাবা, চুপ করলে কেন? আবার গাও।

কমলাকান্ত দেখলেন, এক বৃদ্ধা। মৃদু হাসছেন।

বড় মধুর তোমার গান। আমায় আরও কিছু গান শোনাবে?

কে এই বৃদ্ধা! এঁকে তো চিনিনে। দেখিনি কোথাও!

মা, গান আমি তোমায় শোনাচ্ছি। কিন্তু আগে বলো, তুমি কে? কোথা থেকে এলে?

সে কি গো? আমায় তুমি চিনতে পারলে না, বাবা আমি যে তোমাদের ধর্মনারায়ণের মা!

তাই বল। আগে দেখিনি কিনা, তা-ই।

ধর্মনারায়ণ হোলো, এই গাঁয়েরই এক গোয়ালা। রোজই সে এই মন্দিরে দুধ ক্ষীর জুগিয়ে যায়। এই বৃদ্ধা তার মা।

কমলাকান্ত খুসী হলেন।

তা, মা, এত রাত্রে কেন?

ফুল তুলতে এসেছিলাম। কিন্তু এখনও রাত্রি আছে। তুমি গান গাইছিলে। বড় ভালো লাগছিলো। তাই গান শুনছিলাম।

কমলাকান্ত গাইলেন,

(আহা) তাই শিবের নয়ন ভুলেছে।
অনুপম রূপ চিকণ কাল হেরিয়ে॥
তা না হ'লে ত্রিলোচন পরম যতনে কেন,
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে॥
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে!
হারাইয়ে নিজ মণি, ব্যাকুলা হইয়ে ফণী,
ওরূপ নেহারি রয়েছে॥
হারাইয়ে ফুল ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।
ওরূপ-আনন্দ-নিধি, কমলাকান্তের হৃদি-
সরোজে প্রকাশ করেছে।

এই রকম একটির পর একটি ক'রে অনেকগুলি গান শোনালেন সেদিন কমলাকান্ত। শোনালেন ধর্মনারায়ণের মা-কে।

পরদিন ধর্মনারায়ণ এলো।

হ্যাঁরে ধর্ম, কাল তুই ছিলি কোথায়? কাল তোর মা এসেছিলেন মন্দিরে। তাঁকে কত গান গেয়ে শোনালুম!

সে কি ঠাকুর মশাই! আমার মা-তো বহু দিন গত হয়েছেন! আমি যখন ছোট শিশু তখন তিনি মারা যান। এক মাসীমার কাছেই আমি মানুষ। তিনিও আজ দশ বছর হোলো মারা গিয়েছেন। বিশালাক্ষী দেবী-ই আমার মা। এই মা ছাড়া, পৃথিবীতে আমার আপন বলতে আর কেউ নেই। মাত্র দেহ রক্ষার জন্যে এই ব্যবসা করি। আর, যখন মনটা বাবা মা-র জন্যে খুবই চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনই এই মন্দিরে এসে আপনার কাছে বসি। গান্ শুনি।

কমলাকান্ত সব বুঝলেন। ধর্মনারায়ণও বুঝতে পারলো। কমলাকান্ত লুটিয়ে পড়লেন বিশালাক্ষী দেবীর সামনে। নয়নজলে বুক ভেসে গেলো। মা মা মা!

ধর্মনারায়ণও কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে লাগলো আনন্দে। হা-রে ধর্ম! তোর জীবন আজ সার্থক! মা আজ নিজে স্বীকার করেছেন, আমি তাঁর ছেলে। তিনি আমার মা। তোর দুধ ক্ষীর জোগানো এতদিনে সার্থক হোলোরে, সার্থক হোলো! মা মাগো! তোর এত করুণা এই কাঙাল গয়লার উপর! এত করুণা! মা, মাগো!

এই সময়ে কমলাকান্তের দারিদ্র্য চরমে উঠলো। সংসার পড়লো একেবারে অচল হ'য়ে।

কমলাকান্তের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। চলতে লাগলো তপস্যা। কঠোর তপস্যা। এ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেন তিনি।

কমলাকান্ত আপন মনে গান করেন।

মন তুই কাঙালী কিসে।
কালী নামামৃত সুধা পান কর মন ঘরে বসে।
ভবার্ণবে মায়া তার, কত ডুব্‌ছে উঠ্‌ছে যাচ্ছে ভেসে॥
ওরে, আনন্দধামেতে রয়ে রঙ্গ ছাখ্‌ তুই হেসে হেসে॥

দিন যায়।

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তের কাছে দীক্ষা নিলেন।

একদিন মহারাজা বিশেষ সমাদরে কমলাকান্তকে রাজসভায় নিয়ে এলেন। সবাই কমলাকান্তের গান শুনতে চাইলেন।

কমলাকান্ত সেদিন গাইলেন—

জাননা রে মন, পরম কারণ, শ্যামা মা শুধু মেয়ে নয়।
(সে যে) মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হ'য়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি দানবচয়ে করে সভয়।
(কভু) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্বতী, কখন শ্রীমতী, কখন রামের জানকী হয় ॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।
(কভু) আপন মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ-ভব যাতনা সয় ॥
যেরূপে যে জনা, করয়ে সাধনা, সেরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে, কমল মাঝারে উদয় হয় ॥

কমলাকান্তের সেদিনকার মর্মস্পর্শী গানে সবাই মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন, কমলাকান্তের মা কখন কৃষ্ণ হন, কখন পার্বতী কখন বা জানকী হন। যিনি যেরূপে তাঁকে দেখতে চান, মা তাঁকে সেই রূপেই দেখা দেন। সকলেই বুঝলেন, কমলাকান্ত শাক্ত বৈষ্ণব এ-সব ভেদাভেদের উর্ধ্বে।

তেজশ্চন্দ্র কোটালহাটে কমলাকান্তের বাস-ভবন নির্মাণ করিয়ে দিলেন। নিয়ে এলেন কমলাকান্তকে কোটালহাটে। কোটালহাটের শ্যামা বিগ্রহ এই সময়ে জাগ্রতা হ'য়ে ওঠেন। যুবরাজ প্রতাপ চাঁদও এর কয়েকদিন বাদে দীক্ষা নিলেন কমলাকান্তের কাছে।

সেদিন অমাবস্যার রাত্রি। ঝড় বৃষ্টি চলছে। দারুণ ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি।

কমলাকান্ত ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রয়েছেন। পূজার লগ্ন ব'য়ে যায় সেদিকে খেয়ালও নেই। কারণ বারি পান করছেন মুহুর্মুহু।

ধ্যানভঙ্গ হোলো।

শুরু হোলো স্তবপাঠ।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ খড়গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ পাণিকাম্॥.....

থম্ থম্ করছে মন্দির। স্তবপাঠ ক'রেই চলেছেন কমলাকান্ত। বাইরে ঘন ঘোর অন্ধকার। তার সঙ্গে তখনও ঝড় বৃষ্টি।

মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চিতাম্॥.....

বিষ্ণু কর্মকার পরিচারক। সে দেখলো, পূজোর লগ্ন ব'য়ে যায়।

ঠাকুর মশাই, একটু স্থির হ'য়ে বসুন। সময় যে অতীত হ'য়ে যাচ্ছে।

ওরে ত্যাখ্, বিষ্ণু, চেয়ে ত্যাখ্। আজ আমার মায়ের কী রূপ! বিষ্ণু, আমি দেখতে পাচ্ছি, মায়ের গলার মুণ্ডমালা থেকে রক্তধারা বেরিয়ে আসছে। ভাসিয়ে লাল ক'রে দিচ্ছে মা-র ঘন মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। মা-র দুই কানে যে দুটো শব-শিশু অলঙ্কারের মতো দুলছে তাদের মুখও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মা আমার হাসছেন। দুই ঠোঁট থেকে রক্তধারা বিনির্গত হ'য়ে মা-র মুখখানি লাল হ'য়ে উঠেছে।

বিষ্ণু, বিষ্ণু, মায়ের পূজোয় আজ মোষ উৎসর্গ করবো।

সে কি ঠাকুর মশাই! মোষ কোথায় পাবো? ঝড়-বাদল। তায় অমাবস্যার আঁধার। রাত্রিও এত হোলো। আগে বললে জোগাড় করে রাখতুম!

ওরে, মায়ের আজ কী রূপ! কী রূপ! আমি স্পষ্ট বুঝতে

পারছি—মা চাইছেন। রুদ্রাণী মা আমার চাইছেন! তুই ভাবিস্ নে, বিষ্ণু। মায়ের পূজোর জোগাড় মা-ই কোরবেন।

তবুও বিষ্ণু বেরিয়ে পড়লো।

হঠাৎ দেখা গেলো, সেই ঝড়-জলের মধ্যেই কয়েকজন লোক আসছে পূজোর জিনিসপত্র আর একটা মোষ নিয়ে। তারা পূজো দেবে।

পূজো হোলো সাড়ম্বরে। মোষ বলিও হোলো। পূজো হ'য়ে গেলে কমলাকান্ত গাইলেন—

আজ কেন লোল-বসনা বিবসনা শবাসনো পরে।
হর উরে কি কর জননী ?
স্খলিত অম্বর কেশ, ধ'রেছ মা কেমন বেশ,
পদভরে কম্পিতা ধরণী।
নর-কর-শিরে-হার, একি তব অলঙ্কার,
কি কারণে না পর অম্বর হেমমণি।
ত্যাজি মণি-মন্দির কেন মা শ্মশানে ফের,
উন্মত্তা যেন পাগলিনী।
ক্ষণে ক্ষণে হুহুঙ্কার, ধরাতে না সহে ভার,
কম্পিত হয়েছে সহকার কূর্ম ফণী।
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী,
হর উরে ধীরে ধীরে নাচ গো জননী ॥

কমলাকান্ত মাকে নিয়েই আছেন। মা-র রূপ দেখে তিনি আত্মহারা।

তেঁই শ্যামা রূপ ভালোবাসি।
কালি! জগমনোমোহিনী এলোকেশী।
তোমায় সবাই বলে কালো কালী,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী ॥

কখনও বা গান ধরেন—

নব-সজল জলধর কায়।
শ্যামারূপ হেরিলে, কালীরূপ হেরিলে, প্রাণ গ'লে যায়॥
কপালে সিন্দূর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায় (মায়ের)।
হাসিতে হাসিতে, দানব নাশিছে, রুধির লেগেছে গায়.(মায়ের)
চরণযুগল অতি সুশীতল, প্রফুল্ল কমল প্রায় (আ মরি)।
কমলাকান্তর মন নিরন্তর, ভ্রমর হইতে চায় (ও পদে)॥

প্রতাপচাঁদ কমলাকান্তের বড় অনুগত হয়েছেন।

সেদিন অমাবস্যায় কমলাকান্ত প্রতাপচাঁদকে পূর্ণাভিষেক করলেন।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র শুনলেন এই কথা। তিনি এলেন। দেখলেন সামনেই মদের বোতল। বড় রাগ হোলো তাঁর। তিরস্কার করলেন গুরুদেব কমলাকান্তকে।

মহারাজ! এ বোতলে সুরা দেখলেন! এ যে সুধা! খাঁটি দুধ।

তেজশ্চন্দ্র দেখলেন, মদ নয়, দুধ। সত্যিই দুধ।

মহারাজা বিস্মিত হলেন।

যদি দুধ-ই হবে, তবে এ দুধ দিয়ে মাখন বানানো যাবে?

নিশ্চয়-ই যাবে।

মাখন বানানো হোলো।

গুরুদেবের অবমাননা হয়েছে। ক্ষুণ্ণ হলেন প্রতাপচাঁদ। এই ঘটনার কয়েকদিন বাদেই প্রতাপচাঁদ সংসার ত্যাগ করলেন।

কমলাকান্ত কাশী এসেছেন।

সেবার কাশীধামে বড় ঘটা ক'রে কালী পুজো হচ্ছে। পুজো করছেন কমলাকান্ত নিজে।

ঘনঘন কারণ বারি পান করছেন। কণ্ঠে শুধু মা মা।

একদল বলে উঠলেন—এ কী অনাচার! মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন না? জীবন্ত করবেন না বিগ্রহ?

তোমরা দেখতে চাও মা জীবন্ত কি না?

সামনেই বলিদানের খড়্গ। সেই খড়্গ দিয়ে প্রতিমার বাহুতে আঘাত করলেন কমলাকান্ত। দর দর ধারায় সেখান থেকে রক্ত বেরুতে লাগলো। ফিন্‌কি দিয়ে।

সবাই ভয়ে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় হতবাক্‌ হ'য়ে গেলেন।

কমলাকান্তের চরণে সকলে লুটিয়ে পড়লেন।

কাশীতে থাকতে কমলাকান্তের আর ইচ্ছে হোলো না। ফিরে এলেন।

কমলাকান্ত এখন বৃদ্ধ হয়েছেন।

প্রতাপচাঁদ নেই। নেই উত্তর সাধিকা কমলাকান্ত-গৃহিণী। তিনি গত হয়েছেন।

গুরুদেবকে দেখতে এলেন তেজশ্চন্দ্র।

তিনি বললেন, গুরুদেবকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেতে হবে।

কমলাকান্ত হাসলেন।

কি গরজ? কেন গঙ্গাতীরে যাবো?

আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে

বিমাতার কি শরণ লব?

তিনি তেজশ্চন্দ্রকে বললেন, আমার জন্যে তৃণশয্যা বিছিয়ে দাও।

মরণের আর দেরী নেই। কমলাকান্তের চোখে মুখে দিব্য আভা। তিনি ধীরে ধীরে গাইতে লাগলেন—

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে।
ধ্যান কালী জ্ঞান কালী প্রাণ কালী আমার রে॥ ......

এই গান গাইতে গাইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কমলাকান্ত।

মায়ের কোলে মায়ের ছেলে গিয়ে বসলেন।

——

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, বিঠ্ঠল নারায়ণ ও জনৈক যুবক

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হয়েছেন।

সন্ন্যাসীর গৃহে থাকবার বিধি নেই।

কোথায় থাকবেন ?

জননী শচীদেবীর অনুমতি নিয়ে নীলাচলে গিয়ে রইবেন ঠিক হোলো।

এলেন নীলাচলে।

এখানকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম।

শুধু নীলাচলের কেন ? সারা ভারতেরই অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

ঘোর বৈদান্তিক। ভক্তিবাদে আদৌ বিশ্বাস নেই।

আশ্চর্য ব্যাপার হোলো, কয়েক দিনের মধ্যেই বেদান্তের এই মহাপণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। হলেন মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত।

সার্বভৌম-বিজয় কাহিনী সকলেরই জানা।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হ'য়ে সার্বভৌম বলেছিলেন—

> জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্প কার্য।
> আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য॥
> তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
> আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥

কঠিন লৌহপিণ্ডকে তুমি কোমল নবনীতে পরিণত করলে। রজ্জু বিনা বাঁধলে মত্ত ঐরাবতকে। জলসেক না দিয়ে জুড়িয়ে দিলে হৃদয়দাহ। তোমার কৃপায় অগ্নিগর্ভ বজ্র অমৃতসরস হ'য়ে উঠলো।

নীলাচলে কয়েক দিন থেকে তিনি দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি ভ্রমণ

করবার জন্যে রওনা হলেন। আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের খোঁজ করবেন।

শ্রীচৈতন্য চলেছেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং!
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাং॥

মুখে শুধু একই বাক্য।

এই একই বাক্য মুখে নিয়ে চলেছেন শ্রীচৈতন্য। আর যাকেই দেখছেন, বলছেন, বলো হরি, বলো কৃষ্ণ।

আলিঙ্গন করছেন। এই সুযোগে শক্তি সঞ্চার ক'রে দিচ্ছেন। ফলে তিনিও হ'য়ে উঠছেন পরম বৈষ্ণব, মহাভাগবত।

শ্রীচৈতন্য চলেছেন।—

কনক মানস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহুরঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দ মূর্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥

শ্রীচৈতন্য চলেছেন। মুখে বলো হরি, বলো কৃষ্ণ।

চতুর্দিকে রব উঠলো হরি হরি। রব উঠলো কৃষ্ণ গোপাল।

অরুণ বসনে শোভিত এমন কাঞ্চন-দেহ কেউ দেখেনি। দেখেনি এমন কম্প-স্বেদ। এমন অশ্রুধারা। দুই চোখে করুণার কালিন্দী-প্রবাহ। যে দেখে সেই-ই চমৎকার গণে। ফিরে যেতে চায় না। ছেড়ে যেতে চায় না।

শ্রীচৈতন্যের মুখে বলো হরি, বলো কৃষ্ণ!

যে দেখে তার মুখেও ধ্বনি ওঠে, বলো হরি, বলো কৃষ্ণ!

শ্রীচৈতন্যকে দেখে লোকে ছোটে আকুলি-বিকুলি। সবারই মুখে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!

শ্রীচৈতন্য চলেছেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

চলেছেন এই ভাবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার ক'রে।

মাতোয়ারা হ'য়ে শ্রীচৈতন্য নাচতে থাকেন।

সে নাচ দেখে, সে প্রেম-ভক্তি দেখে, এ অঞ্চলও বৈষ্ণবায়িত হ'য়ে পড়ে।

এলেন অন্য গ্রামে।

তারা বলে, এই চঞ্চল কলুষ-মলিন চিত্তকে মার্জন ক'রে, শোধন ক'রে দিয়ে যান, প্রভু!

কৃষ্ণে মতিরস্তু! কৃষ্ণে মতি হোক!

মতি থেকেই জাগবে রতি। আগুন যে আধারে থাকে সেই আধারকে উত্তপ্ত করে। তেমনি আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতি যে ভক্তে জাগে, তাঁকেও ক'রে তোলে আনন্দিত। এমন আনন্দ যে বিচ্ছেদেও কৃষ্ণস্ফূর্তি।

তিনি বলেন, যা করলে কৃষ্ণ তুষ্ট হন, সেই কর্মই কর্ম। যে বিদ্যার ফলে কৃষ্ণে মতি জন্মে, সেই বিদ্যাই বিদ্যা। কৃষ্ণের পাদমূলেই আশ্রয়। কল্যাণ কৃষ্ণের পাদমূলেই। কৃষ্ণে মতিরস্তু!

যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিগে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর।
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করেন সকল॥

শ্রীচৈতন্য চলেছেন।

আলালনাথ, গঞ্জাম হ'য়ে শ্রীচৈতন্য এলেন বিদ্যানগরে। বিদ্যানগরে রায় রামানন্দকে আত্মসাৎ করলেন। রায় রামানন্দ

একজন বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি। মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন পরে।

বিদ্যানগর, মল্লিকার্জুন, শিবকাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম, তাম্রপর্ণী এই সব তীর্থ; তা' ছাড়া, আরও অনেক অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে চলতে লাগলেন। এ যেন প্রেমের দিগ্বিজয়। এই সকল স্থানেই

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য ভাণ্ডার— প্রেম শতগুণ বাড়ে॥

এই সব জায়গার লোকদের কী অগাধ বিশ্বাস! শ্রীচৈতন্যকে দেখেছো, তবে আর ভাবনা কি? তুমি তো মহা-ভাগ্যবান! তোমার সমুদয় পাপই নিঃশেষে ক্ষয় হ'য়ে গিয়েছে!

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥

শ্রীচৈতন্য চলেছেন।

দুই চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় অশ্রুপ্রবাহ ছোটে।

সোনার গৌরাঙ্গ ঐ কেঁদে কেঁদে যায়।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কাঁদে উভরায়॥

এ বলে ওকে—ইনি কাঁদছেন কেন?

অপরে বলে—ওরে, যার-ই জন্যে কাঁদুন না কেন, মানুষের চোখে এত জল কখনও দেখেছো? এর-ই নাম বুঝি প্রেমগঙ্গা!

শ্রীচৈতন্য এলেন পাণ্ডুপুরে।

আজকাল এর নাম পাণ্ঢরপুর। কেউ কেউ বলেন পণ্ঢরপুর।

পাণ্ঢরপুরের বিঠ্‌ঠল নারায়ণ।

এখানে এসে শ্রীচৈতন্য এই বিঠ্‌ঠল নারায়ণ দর্শন করলেন। ভূ-লুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম করলেন।

সেবক এসে বিঠ্ঠল নারায়ণের কাহিনী শ্রীচৈতন্যকে শোনালেন। শ্রীচৈতন্য প্রেমে আবিষ্ট হলেন।

এক যুবক।

সে কায়ে মনে বাক্যে পিতৃ সেবাই ক'রে চলে।

তার কাছে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যার বিষয়। তার বিশ্বাস পিতাকে সুখী করলে সকল দেবতাই সুখী হন।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতা॥

এই বিশ্বাসের ভরা নৌকায় পাল তুলে সে চলেছে। পিতাকে সেবা ক'রেই সে সারা দিন কাটায়। পিতাই তার ধ্যান জ্ঞান। আর কোনও দিকে তার খেয়াল নেই।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতা॥

ভগবান প্রীত হলেন।

এলেন নেমে গোলোক থেকে ভক্তের কাছে। এলেন অতিথিরূপে।

পুত্র তখন তন্ময় হ'য়ে পিতার সেবা করছে।

অতিথি এসেছেন জেনেও তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ছুটলো না।

কে যেন ব'লে উঠলো—ওরে, তোর সামনে যে গোলোকবিহারী নারায়ণ। ছাখ্, ছাখ্, চেয়ে ছাখ্।

তা হোক।

ওরে, তোর সামনে যে বিশ্বের পরম দুর্লভ ধন! ছাখ্, চেয়ে ছাখ্।

তা হোক।

ওরে, কোটি জন্ম তপস্যা ক'রেও যার দর্শন মেলে না, তিনি আজ তোর সম্মুখে, বিনা আবাহনে। ছাখ্, চেয়ে ছাখ্। লুটিয়ে পড়

দুই পায়ে। দেবগণও যে পায়ে লুটিয়ে পড়বার লোভে অমরত্ব দেয় বিলিয়ে। সেই পায়ে লুটিয়ে পড়।

তা হোক। তুমি শ্রীকৃষ্ণই হও, আর নারায়ণই হও পিতার সেবা তো মাঝপথে থামিয়ে দিতে পারিনে, ঠাকুর।

হাতের কাছে ছিল একখানা থান ইট।

পিতৃসেবা করতে করতেই সেই থান ইটখানা এগিয়ে দিলো অতিথির দিকে।

বৈঠো, ঠাকুর, বৈঠো।

হাতের কাজ সেরে নিই। তারপর তোমার খোঁজ নেবো। তুমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকো।

পিতৃসেবা চলতে লাগলো।

অন্য কোনও দিকে জ্ঞানগম্যি নেই। অন্য কোনও দিকে চোখ ফেরানো নেই।

তপস্যা চলতেই লাগলো।

হাতের কাজ সারা হোলো।

এইবার তোমার দিকে নজর দিই। কিছু মনে করো নি তো, ঠাকুর?

এ কী! সেই অতিথি কোথায়? কোথায়?

তাঁর জায়গায় কাকে দেখছি? এই ইটের পরে?

এ যে দেখছি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি! শ্রীবিঠোভা মূর্তি! দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

এবার যুবক ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। কেঁদে ফেললো।

সেবায় এতক্ষণ তন্ময় হয়েছিলুম। তাই তোমাকে চিনতে পারি নি। তুমি আমার অপরাধ মার্জনা করো।

ঠাকুর বললেন, তোমার পিতৃসেবায় আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি। তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করো।

তুমি যদি বরই দেবে, তবে এই বর দাও, প্রভু, তুমি এইখানে, এমনিভাবে, চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে। ঠিক এই ইটের উপরেই।

ভুবনমোহন হাসলেন।

তথাস্তু।

এইখানেই থাকবো, বৎস। এইখানেই থাকবো। থাকবো এই ইটের উপরে।

আমাকে সবাই দেখবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই তোমার পিতৃসেবার কথা স্মরণ করবে। পিতৃসেবায় উদ্বুদ্ধ হবে। সবাই জানবে পিতৃ-সেবাই ভগবৎ সেবা।

আমি থাকবো এইখানেই। এই ইটের উপরেই।

যুবক ঠাকুরকে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম করলো।

দুই চোখ দিয়ে জল ছুটলো।

চিত্রং তদেতৎ চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেতৎ নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতৎ বদনারবিন্দং
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্॥

তাঁর এই চরণ-কমল আশ্চর্য। আশ্চর্য তাঁর এই নয়ন-কমল। আশ্চর্য, আশ্চর্য তাঁর এই বদন-কমল। তাঁর এই দেহরূপ চিত্র আহা!—

নিমেষে এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়লো। রাষ্ট্র হ'য়ে পড়লো, যুবকের পিতৃসেবায় মুগ্ধ হ'য়ে নারায়ণ স্বয়ং এখানে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সবাই যুবককে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

সবাই ভগবানের অপার করুণা দেখে আনন্দে আত্মহারা হোলো।

এই বিঠঠল নারায়ণ। পাণ্ডরপুরের বিঠ্ঠল নারায়ণ।

বৈঠ্‌তে বলেছিল। তাই বিগ্রহের নাম রাখা হোলো বিঠ্‌ঠল নারায়ণ।

এই পাণ্ঢরপুরেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বড় ভাই বিশ্বরূপ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু শুনলেন একথা।

সে আর এক কাহিনী।

পাণ্ঢরপুর মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটি রেল স্টেশন আছে।

———

ঠাকুর সর্বানন্দ

মেহারের ভূম্যধিকারী তখন জটাধর।

আগমাচার্য তাঁর দ্বারপণ্ডিত। সর্বানন্দ আগমাচার্যের মেজো ভাই।

আগমাচার্য ও সর্বানন্দের পিতার নাম শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথ প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক বাসুদেব ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র।

সর্বানন্দ একজন রূপবান পুরুষ। সুন্দর তাঁর দেহকান্তি। কিন্তু মূর্খ তিনি। লেখাপড়া আদৌ জানেন না। কথায় আছে না— পণ্ডিতের ঘরে গোমূর্খ। সর্বানন্দ ঠিক তাই—পণ্ডিতের বংশে মহামূর্খ।

এই সর্বানন্দকে নিয়ে রাজসভায় সেদিন কী বিশ্রী কাণ্ডই না ঘটে গেলো!

সেদিন সর্বানন্দ দাদার সঙ্গে রাজসভায় গিয়েছেন। সর্বানন্দের বালকপুত্র শিবনাথও সঙ্গে গিয়েছেন।

সর্বানন্দকে দেখে সকলেই অবাক! রাজা জটাধারীও! সর্বানন্দ তো কখনও সভায় আসে না! আজ হঠাৎ!

মূর্খ ব'লে সর্বানন্দকে রাজা বিদ্রূপ করতে লাগলেন। তাঁকে নিয়ে কথা বেড়েই চললো। শেষে রাজা ব'লেই বসলেন, বামুনের ছেলে হ'য়ে পড়াশুনা তো করলেই না। বলি, পাঁজি দেখতে জান? তারিখ, বার, তিথির খোঁজ রাখো? বলো তো, আজ কি তিথি?

সর্বানন্দ ব'লে বসলেন, আজ পূর্ণিমা।

সভার সকলে হোহো ক'রে হেসে উঠলেন। এ মূর্খ বলে কি! আজ যে অমাবস্যা, পৌষ সংক্রান্তি—এ খবরও রাখে না!

হাসি আর থামে না! সবাই বিদ্রূপে, অপমানে, লাঞ্ছনায় সর্বানন্দকে জর্জরিত ক'রে তুললেন।

রাজা রেগে ফেটে পড়লেন।

ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে এসেছো রাজসভায়! অথচ নেই বিদ্যা, নেই বুদ্ধি। এত বড় পণ্ডিত, তান্ত্রিক সাধক বাসুদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশে এমন কুলাঙ্গারও জন্মে! সাবধান, আর কখনও রাজসভায় এসো না।

ছেলে শিবনাথকে শাসিয়ে দিলেন, দেখবে, তোমার বাবা যেন আর কখনও এ রাজসভায় না আসে। তোমার মাকে এটা জানিয়ে রেখো।

দাদা দ্বারপণ্ডিত হ'য়েও মাথা হেঁট ক'রে গৃহে ফিরে এলেন। ছেলে মা-র কাছে এসে কেঁদে ফেললো।

সর্বানন্দকে নিয়ে বাড়ীর সবাই আর পারেন না। সবাই তাঁকে উপহাস করে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেয়, তিরস্কার করে। স্ত্রী যেন মরা মানুষের মত দিন কাটান। মাগো!—

সর্বানন্দ আজ বড়ই আঘাত পেয়েছেন। নির্মম আঘাত। অন্তরে জেগেছে দারুণ ক্ষোভ। লেখাপড়া শেখেন নি। বুদ্ধিও নেই। এ দুর্বহ জীবন নিয়ে তিনি কি করবেন? এর চাইতে মরণই তো ভালো।

দুঃখে, অপমানে, বেদনায় সর্বানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। গাঁ পেরিয়ে, নদীর তীর ধ'রে তিনি প্রবেশ করলেন নির্জন অরণ্যে।

সারাদিন কেটে গেলো। রইলেন সেই অরণ্যে। বাড়ী ফিরবেন কোন মুখ নিয়ে?

বাড়ীর সবাই ভাবনায় পড়লেন। সর্ব এখনো এলো না! কোথায় গেলো সে? সারা দিন কিছুই খায় নি।

স্ত্রী রইলেন উপবাসী। কি ক'রে খাবেন তিনি? স্বামী খেলেন না।

সব চেয়ে ভাবনায় পড়লো বাড়ীর চাকর পূর্ণানন্দ। সর্বানন্দের পুণ্য দা'।

সর্বানন্দের জন্মের পর থেকেই এই পুণ্য দা' তাঁকে সবচেয়ে ভালবেসেছে। তাঁকে কোলেপিঠে ক'রে বড় ক'রে তুলেছে। যখনই আঘাত পেয়েছেন কারও কাছ থেকে, সর্বানন্দ ছুটে গিয়েছেন পুণ্য দা'-র কাছে। পুণ্য দা' তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছে। আঘাতের ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছে। সর্বানন্দ তাই শিশুকাল থেকেই পুণ্য দা'-কে সব চেয়ে ভালবেসেছেন।

পূর্ণানন্দ জানে সর্বানন্দ একদিন বড় হবে। আজ আছে সে ঘুমিয়ে। কিন্তু একদিন জাগবে-ই। সেদিন সবাই সর্বানন্দকে মান্য করবে। দেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। হ্যাঁ, সর্ব জাগবেই জাগবে। সে বড় হবে-ই। এ মিথ্যে হবার নয়। হবে না। কিন্তু তাব বিলম্ব কত আর ? মা, মাগো! পূর্ণানন্দ প্রণাম জানায় মাকে। জগতের মাকে।

পূর্ণানন্দের যত টান সব সর্বানন্দের 'পরে। সর্বকে আজ সারা দিন সে দেখেনি। সারা-দিন তার মুখে কিছু পড়ে নি। আহা! পূর্ণানন্দ ভাবনায় অস্থির হ'য়ে পড়লো।

এদিকে সর্বানন্দ অরণ্যের মধ্যে চুপ ক'রে বসে আছেন। মনে কত চিন্তাই না জাগে। একবার মনে হোলো, আত্মহত্যা করি। পরক্ষণেই মনে হয়, না, সে যে মহাপাপ।

বিদ্যুতের ঝিলিকের মত একবার মনে উঠলো, লেখাপড়া শিখি। হ্যাঁ, তাই-ই শিখি। লেখাপড়া শিখিনি বলেই তো সবাই অপমান-করে। লেখাপড়া শিখলে সবাই খাতির করবে, মান্য করবে। বিদ্যা অর্জন করতে-ই হবে। কবি কালিদাসও তো বেশী বয়সে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন ব'লে শুনেছি। তবে আর ভয় কি ? কেন আর বিলম্ব ? এখনই শুরু করি।

লেখাপড়া শিখতে সবার আগে দরকার তালপাতার। তালপাতা কোথায় পাই ? কেন ?—ওই যে তালগাছ।

সর্বানন্দ তালগাছে উঠলেন। তালপাতা চাই। লেখাপড়া শিখতে হবে।

কোনও দিন তালগাছে ওঠেন নি। অতি কষ্টে উঠলেন। পাতা ছিড়বেন, এমন সময়ে, কী সর্বনাশ! সভয়ে সর্বানন্দ দেখলেন, সেখানে প্রকাণ্ড এক গোখ্‌রো সাপ! ফোঁস ক'রে ফণা উঁচিয়ে রয়েছে! মারে বুঝি ছোবল!

সর্বানন্দ তখন বেপরোয়া। সঙ্কল্পে দৃঢ় তিনি। প্রথমেই বাধা! —ধ্যেৎ! সে বাধা সইবেন কেন? অত্যন্ত দ্রুত হাত চালিয়ে সর্বানন্দ সাপের ফণা ধ'রে ফেল্‌লেন। তারপর তালের ডগার করাতের মতো ধারালো প্রান্তে সাপটাকে কাটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে সাপটা দু'খণ্ড হ'য়ে গেলো। যাক্।—

ঠিক এই সময়ে এক সন্ন্যাসী চীৎকার ক'রে উঠলেন—

তালগাছে চ'ড়ে এতক্ষণ সাপের সঙ্গে যুঝ্‌লে, তুমি কে?

সর্বানন্দ চেয়ে দেখলেন, এক সন্ন্যাসী।

নেমে এসে সর্বানন্দ তাঁকে প্রণাম করলেন।

বাঘের চামড়া বিছিয়ে গাছের নীচে বসে রয়েছেন। মাথায় তাঁর দীর্ঘ জটা! পরণে লাল রঙের পট্টবস্ত্র। গলায় হাড় ও রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা। প্রচুর কারণ বারি পান করেছেন। তাই চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল।

সন্ন্যাসীকে দেখে সর্বানন্দের কিছুটা ভয় হয়েছে। ভক্তিও হয়েছে। বিস্মিতও যে না হয়েছেন তা নয়।

তুমি কে? এই সন্ধ্যাকালে তালগাছে উঠে কি করছিলে?

তালপাতা পাড়ছিলাম।

কেন পাড়ছিলে?

লেখাপড়া শিখবো।

বড় প্রসন্ন হলাম। তোমার ভয়-ডর নেই। প্রাণের মায়াও করো না। তুমি-ই সাধনের যথার্থ অধিকারী। তোমার কিছু প্রার্থনা আছে? নিঃসঙ্কোচে আমায় বলো।

সর্বানন্দ আজকের ঘটনা আদ্যোপান্ত বললেন। তাই তাঁর একান্ত বাসনা, তিনি বিদ্যা অর্জন করতে চান। শাস্ত্রবিদ হ'তে চান। সকলের কাছ থেকে মান পেতে চান। রাজা তাঁকে অপমান করেছেন। তাঁর সভায় পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চান।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন।

বৎস সর্বানন্দ, যে বিদ্যা লাভ করবার জন্যে তুমি আগ্রহী হয়েছো, তা তো নিস্ফলা বিদ্যা। আমি তোমায় সর্ববিদ্যামন্ত্র প্রদান করবো। সাধনা ক'রে জগন্মাতাকে প্রসন্ন করো। তা হ'লে সর্বসিদ্ধি তোমার করতলগত হবে। রাজসভায় মর্যাদালাভের জন্যে তুমি ব্যাকুল হয়েছো? সর্ববিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করলে শুধু এ রাজসভায় নয়, সারা দেশেব সকল রাজসভায় তুমি মর্যাদা লাভ করবে।

সর্বানন্দেব মন ভোলে না। তিনি বিদ্যা চান। আজকের অপমান বড় বেজেছে যে!

সন্ন্যাসী এবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন।

চুপ ক'রে রইলে কেন? আমার কথায় বিশ্বাস হোলো না বুঝি! বেশ! তবে প্রত্যক্ষ কর মন্ত্রের অমোঘ শক্তি!

সাপের দুই টুকরো পাশেই পড়েছিল। সন্ন্যাসী চিম্‌টে দিয়ে টুকরো দুটোকে কাছে টেনে আনলেন। মন্ত্র প'ড়ে কমণ্ডলুর জল ঢাললেন তার 'পরে।

মুহূর্তের মধ্যেই সাপটি বেঁচে উঠলো। তারপর ধীরে ধীবে সে স্থান ত্যাগ ক'রে অরণ্যের অভ্যন্তরে চ'লে গেলো।

এ-ও সম্ভব! সর্বানন্দ অবাক হ'য়ে গেলেন। মুখ দিয়ে যেন কথা সরে না।

সর্বানন্দ, মন্ত্রের শক্তি প্র॰্যক্ষ করলে! এখন হয়ত আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হবে। আমি মন্ত্রবলে তোমার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগিয়ে তুলবো। লাভ করিয়ে দেবো তোমার সকল অভীষ্ট।

আমি হঠাৎ এখানে এসে পড়েছি বলে মনে কোরো না, সর্বানন্দ।

এ ঘটনা পূর্ব হতেই দৈবনির্দিষ্ট। শোন সর্বানন্দ, আজ শুধু তোমার জন্যেই আমি মেহারে এসেছি। শুভ লগ্ন এসে পড়েছে। এখনই তোমার দীক্ষা দেবো। যাও, শ্মশানের পাশে ঐ যে পুকুর দেখা যাচ্ছে, ঐ পুকুরে স্নান ক'রে এসো।

নিঃসংশয় সর্বানন্দ স্নান ক'রে এলেন।

সন্ন্যাসী তখনই সর্বানন্দকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

মুহূর্তের মধ্যে সর্বানন্দের সকল শরীরে জাগলো আলোড়ন। মনে হোলো, আবদ্ধ শক্তির অর্গল খুলে গিয়েছে! নিমেষে তিনি অসীম শক্তির অধিকারী হ'য়ে পড়েছেন! মুহূর্তের মধ্যে তিনি যেন প্রবেশ করলেন এক নোতুন জগতে। মনে হোলো তিনি আর মূর্খ নেই!

বৎস সর্বানন্দ, তুমি যে আজ এমন সময়ে এখানে এসেছো তার পিছনেও রয়েছে এক দৈবী প্রেরণা। নিশ্চিত জেনো, তুমি স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসো নি। এই আরণ্য-ভূমি বড় পবিত্র স্থান, বৎস। মহামুনি মতঙ্গ এক সময়ে এখানে এসে কঠোর তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পাশেই রয়েছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মতঙ্গেশ শিবলিঙ্গ। আজ এই মাত্র তোমাকে আমি যে মন্ত্রদান করলাম, সেই মন্ত্রের সাহায্যে ওখানে বসেই তোমাকে শক্তি সাধনা করতে হবে। ওখানে বসে তোমার করতে হবে শব সাধনা। পূর্ব জন্মের সাধন-লব্ধ ফল তোমার রয়েছে। ভাগ্যবান তুমি। তুমি অচিরেই জগন্মাতার দর্শন লাভ করবে।

গুরুদেব, কবে এই কাজে ব্রতী হবো, দয়া ক'রে আমায় বলুন।

বিলম্ব নয়, বৎস। আজ থেকেই শুরু করো সাধনা।

চণ্ডালের শব না পেলে তো এ সাধনা করা সম্ভব নয়, গুরুদেব। কোথায় পাবো চণ্ডালের শব? আর যা যা উপকরণের প্রয়োজন তা-ও বা কোথায় মিলবে? কে আমাকে এখানে সাহায্য করবে? আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, গুরুদেব।

বৎস, তোমার চিত্ত এখনও সংশয়-আকুল? তুমি কি বুঝতে পারছো না, যিনি তোমাকে এখানে এনেছেন, আমাদের দুজনের

মিলন ঘটিয়েছেন, সেই জগন্মাতা মহামায়াই কৃপা ক'রে সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন? আর এক কথা বলি, বৎস। তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী পূর্ণানন্দ ছাড়া, আজকের কথা আপাততঃ আর কাউকেই বোলবে না। পূর্ণানন্দই তোমাকে প্রয়োজন মত সাহায্য করবে। গৃহে যাও। পূর্ণানন্দের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।

সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

সর্বানন্দ বেরুলেন পূর্ণানন্দের খোঁজে। তাঁর আর বিলম্ব সইছিলো না।

পথেই দেখা হোলো তাঁর সঙ্গে। সর্বানন্দ সব কথাই, সব ঘটনাই তাকে জানালেন।

পূর্ণানন্দের আনন্দ আর ধরে না। এই আনন্দলাভের জন্যেই তো এতকাল সে এই বাড়ীতে রয়েছে।

পূর্ণানন্দ বারবার তাকাতে লাগলো সর্বানন্দের মুখের দিকে। তার মনের সাধ যেন আর মেটে না।

সর্বানন্দও আজ এক নোতুন মানুষ। আশায় উদ্বেল, আনন্দে অধীর।

পুণ্য দা', গুরুদেব আমায় আদেশ করেছেন, যা কিছু করবো সব-ই যেন তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করি। তুমি আমায় ভালোবাসো। আমিও তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানিনে। সেই জন্যেই গুরুদেব তোমাকেই আমার সাহায্যকারী ঠিক করেছেন। কিন্তু পুণ্য দা', তুমি যে শূদ্র। তুমি কি ক'রে এ-সব ব্যাপারে আমায় সাহায্য করতে পারবে, তা-তো বুঝতে পারছিনে।

সর্ব, আজ একটা অতি গুহ্য কথা তোমায় বলি, শোন।

তোমার ঠাকুর দা' বাসুদেব ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন একজন বড় শক্তি-সাধক। আর, আমি ছিলাম ঠাকুরের অনুগত সহচর, সেবক, ভৃত্য সব। ঠাকুর বাস করতেন সপরিবারে বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে।

প্রতি রাত্রে তিনি মহামায়ার পূজো করতেন। ধ্যান জপ করতেন প্রহরের পর প্রহর ধ'রে। দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। শেষে একদিন মা-য়ের প্রত্যাদেশ মিললো।—বাসুদেব পূর্ববঙ্গের মেহারে যাও। সেখানে গিয়ে সাধনা করো।

কাল বিলম্ব না ক'রে ঠাকুর চ'লে এলেন মেহারে। সঙ্গে এলেন তাঁর স্ত্রীপুত্র সবাই। আমিও সঙ্গে এলাম। কিছুকালের মধ্যেই মেহারের রাজা তাঁর অনুগত হ'য়ে পড়লেন। নিলেন তাঁর কাছে দীক্ষা। তিনি ঘর বাড়ী তৈরী করিয়ে দিলেন। কিছু জমি-জমারও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

দীর্ঘকাল এই মেহারে থেকেই ঠাকুর সাধনা করলেন। কিছু সিদ্ধাই লাভও হোলো। কিন্তু, সর্ব, সে আর বড় কথা কি! মায়ের দর্শন যে হোলো না।

একদিন ঠাকুর গেলেন কামাখ্যা তীর্থে। সেখানেও সঙ্গে রইলাম আমি। কামাখ্যায় গিয়ে তিনি নিমগ্ন হলেন দুশ্চর তপস্যায়।

বহু দিন কেটে গেলো। ঠাকুর আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করলেন। তবু মায়ের দেখা নেই। বড় ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন তিনি। মা-কে দেখবার জন্যে কী আগ্রহ!

একদিন প্রত্যাদেশ এলো।

শোন বাসুদেব, এ জন্মে তুমি আমার দর্শন পাবে না। পরজন্মে তুমি তোমারই পৌত্র হ'য়ে জন্মাবে। সেই পৌত্রই আমার দর্শন পাবে। মেহারে মতঙ্গ মুনির স্থাপিত মহাদেব শিলা যে বেদীর নীচে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন, সেই বেদীতে বসেই আগামী জন্মে তুমি তন্ত্রমতে আমার সাধনা করবে। লাভ করবে সিদ্ধি।

মহামায়া সাধন বিধি ও মন্ত্র জানিয়ে দিলেন।

ঠাকুর কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতেই সব কথা জানালেন আমাকে। তারপর ঠাকুর মায়ের প্রদত্ত সাধন বিধি আর মন্ত্র একখানা তামার পাতে খোদাই ক'রে সেই তামার পাতখানি আমায় দিলেন।

ঠাকুর আর মেহারে ফিরে এলেন না। মহামায়ার ধ্যান করতে করতে কামাখ্যা তীর্থেই দেহরক্ষা করলেন।

তামার পাতখানি নিয়ে আমি একা ফিরে এলাম মেহারে।

একটু অপেক্ষা করো, সর্ব। আমি এলাম ব'লে।

কিছুক্ষণ বাদে পূর্ণানন্দ ফিরে এলো সেই তামার পাতখানি নিয়ে।

এই ছাখ, সর্ব, সেই তামার পাত। তুমি যে মন্ত্র আজ লাভ করলে, ছাখ, ঠিক সেই মন্ত্রই এই তামার পাতে লেখা রয়েছে।

সর্ব, আজ তুমি সাধনায় সিদ্ধ হবে। আজ-ই তুমি মহামায়ার দর্শন পাবে। রাত গভীর হোলো। চলো যাই। তোমার গুরুদেবের নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে তুমি আসন পাতবে। চলো।

পুণ্য দা', শবের কি হবে?

চিন্তার কিছু নেই, সর্ব। সব-ই জোগাড় হবে। দৈব আজ তোমার অনুকূল।

দুজনে এলেন সন্ন্যাসীর নির্দেশিত স্থানে।

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শেয়ালের, পেঁচার ডাক শোনা যায়। অরণ্য আর আঁধার হ'য়ে ওঠে ভয়াবহ।

সর্ব, এখন তুমি তোমার গুরুদেবের নির্দেশমতো সাধনপীঠে ব'সে যাও। যা যা করতে বলেছেন, ঠিক তাই-ই পালন করবে।

আর এক কথা শোনো। উতলা হ'য়ো না। আমি-ই হবো তোমার শব। শ্বাসরোধ ক'রে আমি এক্ষুনি দেহত্যাগ করবো। তুমি আমার শব-দেহের উপরে ব'সে শুরু করো তোমার সাধনা। শুরু করো মন্ত্র জপ। জেনো, সর্ব, আমার শব-ই খাঁটি শূদ্রের শব।

আতঙ্কে শিউরে উঠলেন সর্বানন্দ!

এ কী কথা বলছো তুমি, পুণ্য দা'? তুমি স্বেচ্ছায় মরবে, আর, তোমার দেহের উপরে ব'সে আমি সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করবো!

কাজ নেই আমার এমন সিদ্ধিলাভে। না-ই বা দেখলাম মা-কে এমনি মর্মান্তিক উপায়ে।

শোন সর্ব, আমার বয়স হয়েছে। কতদিন আর বাঁচবো? আমি শুধু দিন গুনছি, কবে আমার সর্ব সাধনায় সিদ্ধ হবে? কবে সে মা-র মুখখানি দেখবে? কবে আমার জীবন সার্থক হবে? কবে সফল হবে আমার ঠাকুরের পূর্বজনমের সাধনা? আজ আমার গুরুদেব বাসুদেব ঠাকুরের প্রত্যাদেশ সফল হবার দিন। এই মহৎ কাজে আমার তুচ্ছ দেহটাকে নিবেদন করতে পারবো, এ যে আমার মহাভাগ্য, সর্ব।

তা ছাড়া, সর্ব, তোমার ঠাকুর দা'-র তপস্যার কথাও ভাবো। ভাবো তোমার গুরুদেবের আদেশের কথা। আর, ভাবো আমার কথা-ও। আজ এ দেহ যদি মায়ের কাজে না লাগে, তবে আজ-ই আমি নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করবো।

অগত্যা সর্বানন্দ রাজী হলেন। রাজী না হ'য়ে উপায়ই বা কি!

তুমি যা ভালো বোঝ, তুমি আমায় যা যা করতে বলবে, তাই-ই করবো, পুণ্য দা'। তুমি দুঃখ কোরো না।

শোন সর্ব, জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলে তোমার জীবনে আজ এই সুযোগ এসেছে। আজ তোমার ঠাকুর দা'-র, তোমার, আমার সকলেরই মহাভাগ্যের দিন। ঠিক এখনই মহালগ্ন। ভুল ত্রুটি করবে না। ভয়, দ্বিধা, লোভ, এ-সব কিছুই মনে আনবে না। কোনও কিছুতেই টলবে না। যতক্ষণ না অভীষ্ট লাভ হয় ততক্ষণ একমনে, পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা ক'রে যাবে। সাবধান, সাবধান।

হ্যাঁ, আরও এক কথা। আজ মা আবির্ভূত হবেন। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তিনি তোমায় বর দিতে চাইবেন। তুমি তখন অবশ্যই বলবে, সে-সব পুণ্য দা' জানে।

আমি আবার বলি, সাবধান। আমার একটা নির্দেশও ভুলে যেও না।

পূর্ণানন্দ দেহত্যাগ করলেন।

তার শব-দেহের উপর ব'সে সর্বানন্দ শুরু করলেন সাধনা। মন্ত্রজপ।

রাত্রি গভীরতর হোলো। অন্ধকার গাঢ়তর।

সর্বানন্দের ধ্যানের নিবিষ্টতা বাড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে সর্বানন্দ আত্মহারা হ'য়ে পড়লেন।

কেটে গেলো বেশ কিছুক্ষণ। সর্বানন্দ সাধনা ক'রেই চলেছেন।

হঠাৎ শোনা গেলো, কারা যেন একসঙ্গে আর্তনাদ ক'রে উঠলো। বহু বিচিত্র কণ্ঠের মিলিত আর্তনাদ! আর্তনাদ তীব্র, তীব্রতর হ'তে লাগলো!······থেমে গেলো সে আর্তনাদ! কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই শুরু হোলো পৈশাচিক তাণ্ডব! লাফালাফি, মাতামাতি, নাচানাচি! সঙ্গে বীভৎস চীৎকার!······বনের গাছগুলোর বড় বড় ডাল মড় মড়, মড় মড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ছে যেন! একটা বড় ডাল সর্বানন্দের মাথায় পড়লো নাকি!·····সারা পৃথিবীর সব ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা এরা এক সঙ্গে খিল খিল, খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো! উঃ! কী সে বিকট হাসি!······নাচছে তারা!······মারামারি করছে! করুক! করুক! যে যা খুসী করুক! আজ সর্বানন্দ নির্ভয়। আজ কোনও কিছুতেই তিনি টলবেন না। আজ সর্বানন্দ কৃতসঙ্কল্প।

সর্বানন্দ মায়ের ধ্যান ক'রেই চলেছেন। মাঝে মাঝে কণ্ঠে মা মা!

আচম্বিতে নেমে এলো আকাশ থেকে অপ্সরা কিন্নরীর দল! শুরু হোলো অপূর্ব মোহন নৃত্য! শোনা যায় নূপুর নিক্বণ! অপূর্ব সঙ্গীত! তারা স্বচ্ছন্দে গান গেয়ে চলুক। নাচুক, নাচুক তারা! আজ সর্বানন্দ নির্ভয়। আজ কিছুতেই তিনি টলবেন না। কিছুতেই তিনি প্রলুব্ধ হবেন না। আজ সর্বানন্দ কৃতসঙ্কল্প। মা মা!

ধ্যান চলতেই থাকে। আরও গভীর। আরও!······

······শোনা যায় মেঘের গর্জন। কড় কড়, কড় কড়। বাজ পড়ছে মুহুর্মুহু। ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হোলো। বাতাসের শোঁ শোঁ,

শোঁ শোঁ। তা হোক! যাক্ সৃষ্টি রসাতলে! আজ সর্বানন্দ নির্ভয়। তিনি একনিষ্ঠ সাধনায় তৎপর। আজ তিনি কৃতসঙ্কল্প।
……এ কী! হঠাৎ আলো দেখা যায় যে! তবে কি রাত্রি শেষ হ'য়ে এলো? এসে পড়লো দিন? না না। তা কি ক'রে হবে?
……জেলেরা মাছ ধরছে নাকি! অবিরাম জাল ফেলার শব্দ! ছলাৎ ছলাৎ!……এবার যে আরও ফর্সা হ'য়ে গেলো। এত শীঘ্র ভোর হ'য়ে গেলো! তবে কি সাধনা বিফল হবে? না না। আজ সর্বানন্দ সফল হবেন-ই। ও-সব মায়া। ধ্যানে বিঘ্ন ঘটানোর অপচেষ্টা। বিভ্রান্ত করবার জন্যে ও-সব ছলনা! —ছলনা! সর্বানন্দ! স্থির থাকো! চঞ্চল হয়ো না। আজ তুমি সফল হবে-ই।

হঠাৎ প্রাণহীন শব-দেহ ন'ড়ে উঠলো যেন! শব যেন ঠেলে উপর দিকে উঠতে চায়। তা হবে না। হতে দেবেন না সর্বানন্দ। তিনি সবলে শব চেপে ধরেন। মায়ের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত সর্বানন্দ আসন থেকে উঠবেন-ই না। আজ সর্বানন্দ কৃতসঙ্কল্প।

অকস্মাৎ সর্বানন্দের মনে জাগে উল্লাস। আনন্দ। সে আনন্দ চেপে রাখেন সাধ্য কি! আনন্দ! চারদিকেই যেন আনন্দ! আকাশে বাতাসে। গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। সকল জায়গাতেই আনন্দ—সর্বত্র! উল্লাস!……তবে কি মা আসছেন? মা আসছেন?……হ্যাঁ, মা-ই আসছেন! মা আসছেন! এই তো সারা বনভূমি, দশ দিক আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো! চারি দিকে আলো—দিব্য জ্যোতি! এই তো মা এসেছেন! ওরে সর্বানন্দ, চেয়ে ভাখ, মা এসেছেন! মা এসেছেন!

সেই আলোকমণ্ডলের মধ্যে আবির্ভূত হ'য়ে মা দেখা দিলেন সর্বানন্দকে। দেখা দিলেন মহাদেবী। মহামায়া।

মা আবির্ভূত হলেন সর্বানন্দের সম্মুখে।

সর্বানন্দ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। মা মা!

চোখের জল কি আর বাধা মানে?

ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করলেন সর্বানন্দ। মা-র মুখখানি দেখতে লাগলেন। কী রূপ। কী রূপ!

মা-কে দেখে অনর্গল স্বরচিত স্তবপাঠ করতে লাগলেন। স্বতঃস্ফূর্ত! স্তবের পর স্তব পাঠ ক'রে চলেছেন সর্বানন্দ। নির্ভুল, সুন্দর, মধুর আবৃত্তি!

অপূর্ব! অচিন্ত্যনীয়!

কয়েক প্রহর পূর্বেও যিনি লেখাপড়ার কিছুই জানতেন না, তিনি অপূর্ব সুন্দর স্তব রচনা ক'রে চলেছেন সংস্কৃত ভাষায়, আর তা আবৃত্তি ক'রে চলেছেন!

এ দৃশ্য অলৌকিক! এ ঘটনা অভূতপূর্ব!

যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহজলধৌ সংনর্তয়ন্তী স্বয়ম্
যন্মায়া পরিমোহিতা হরিহরব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ।
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং যদ্ যোগিগম্যং ফলম্
তুচ্ছং যৎপদসেবিনাং হরিহরব্রহ্মত্বমস্তে নমঃ॥
বেদো ন যৎ পারমুপৈতি মাতর্নৈবাগমো ন প্রমথাধিপশ্চ।
কস্মান্নরঃ ক্ষীণ মতিস্তবাম্ব! তদ্রূপ সম্ভাবন তৎপরঃ স্যাম্॥

... ...

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরানন স্তং ত্বমেব সর্ব পবন স্তমেব।
ত্বমেব সূর্যঃ শশলঞ্ছন স্তং ত্বমেব শৌরিস্ত্রিদশা স্তমেব॥

... ...

—যিনি মোহজলধিতে প্রাণিগণকে নিমগ্ন ক'রে স্বয়ং নাচিয়ে চলেছেন; হরি, হর, ব্রহ্মা আদি জ্ঞানিগণ যাঁর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আছেন, যাঁর ঈষৎ অনুগ্রহে যোগিগম্য ফল করতলগত হয়, অর্থাৎ কিনা ব্রহ্মত্ব পদ লাভ হয়, আর, যাঁর পদসেবীদের কাছে হরি হর ব্রহ্মত্ব পদ তুচ্ছ, সেই তোমাকে আমি প্রণাম করি।

—মা, বেদ যাঁর পারগামী হয় নি, আগমও যাঁর উপলব্ধি করতে পারে নি, এমনকি প্রমথ-অধিপতি মহাদেবও যাঁর সীমা নিরূপণ করতে

অক্ষম, তোমার সেই অবর্ণনীয় স্বরূপের বর্ণনা করা আমার মতো হীনমতি মানুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে ?

... ...

—তুমি বিষ্ণু, তুমি চতুরানন ব্রহ্মা, তুমি মহেশ্বর, তুমি পবন, তুমি সূর্য, তুমি শশধর, তুমি যম, তুমিই দেবগণ।

... ...

স্তব শেষ হোলো।

ত্রিলোকে যত সুধা আছে সব একত্রীভূত ক'রে কণ্ঠে এনে দেবী বললেন—

বৎস সর্বানন্দ, তোমার উপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থন কর।

মা, মাগো! তোমার অভয় পদযুগল স্বচক্ষে দেখলাম। এর চাইতে তো অধিক সৌভাগ্যের কথা ভাবতে পারিনে, মা। আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে। মা, মাগো! আমার আর কোনও কামনা নেই, প্রার্থনা নেই।

বৎস, তুমি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করো। আমি বড় প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করি। জগৎবাসী দেখুক, জানুক, তোমাকে আমি কত ভালোবাসি !

মা, মাগো! যদি বর-ই দেবে, তবে আমার পুণ্য দাদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো। পুণ্য দা' যে বর চায়, সেই বর-ই দাও, মা! মা, ঐ আমার পুণ্য দাদা। সে এখন শব মাত্র।

মা তাকালেন শবের দিকে। তার পর দক্ষিণ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন পূর্ণানন্দের শব-দেহ।

নিমেষে পূর্ণানন্দ জীবিত হ'য়ে উঠলেন।

পূর্ণানন্দ পুনর্জীবন লাভ ক'রে ধন্য হলেন। ভূ-লুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম করলেন দেবীকে। তিনিও দেবীর স্তব করলেন।

বৎস পূর্ণানন্দ, সর্বানন্দের হ'য়ে তুমি বর প্রার্থনা করো।

যদি করুণা-ই করলে, মা, তবে তোমার দশমহাবিদ্যারূপ একবার আমাদের দুইজনকে দেখাও।

তথাস্তু, বৎস। প্রত্যক্ষ কর দশমহাবিদ্যা।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী এই পর্যায়ে দশমহাবিদ্যারূপ সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হোলো।

সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ দশমহাবিদ্যা রূপ একের পর এক দেখছেন। সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে স্বরচিত স্তব পাঠ ক'রে সেই সেই দেবীকে স্তুতি করছেন, প্রণাম করছেন। উভয়েরই কপোল বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ছে। সে এক মহিমময় দৃশ্য।

তারা মূর্তি উভয়ের সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'লে

সর্বানন্দ স্তব করলেন—

শতকোটি দিবাকর কান্তিযুতম্
বিধিবিষ্ণু শিরোমণি রত্নধৃতম্।
চলদুজ্জ্বল নূপুর গানযুতম্
জগদীশ্বরি! তারিণি! তে চরণম্॥

—হে জগদীশ্বরি, হে তারিণি, তোমার চরণযুগল শতকোটি দিবাকরের উজ্জ্বল দীপ্তিসমন্বিত। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোমণির রত্নবিনির্মিত মধুর নূপুর পরিহিত।

পূর্ণানন্দ স্তব করলেন—

বিষয়ানল তাপিত তাপহরম্
বিধি শৌরি মহেশ বিধানকরম্।
শিবশক্তিময়ং ভয়নাশকরম্
জগদীশ্বরি! তারিণি! তে চরণম্॥

—হে জগদীশ্বরি, হে তারিণি, তোমার চরণযুগল বিষম বিষয়ানল-সন্তপ্ত প্রাণীদের তাপহরণকারী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নিয়ামক শিব-শক্ত্যাত্মক ও ভীতিনাশক।

দশমহাবিদ্যারূপ দেখে কৃতার্থ হলেন দুজন।—সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ।

... ...

দেবী আবার নিজ মূর্তি ধারণ করলেন।

বৎস পূর্ণানন্দ, তোমার আর কি প্রার্থনা আছে বল।

মা, এই আশীর্বাদ কর, তোমার এই পুত্র সর্বানন্দের বংশের সবার-ই যেন তোমার পাদপদ্মে মতি থাকে।

তথাস্তু!

আজকের এই সাধনপীঠ যেন কখনও কলুষিত না হয়।

তথাস্তু!

আরও এক নিবেদন আছে, মা। আজ রাজা জটাধরের সভায় সর্বানন্দ মূর্খের মতো ব'লে ফেলেছে যে, আজ পূর্ণিমা। তোমার এই ভক্তের মর্যাদা তোমাকে রাখতে হবে, মা। এখনও অমাবস্যা শেষ হয় নি। আমার প্রার্থনা, মা, মেহারের অন্ধকার আকাশকে আজ পূর্ণিমার আলোয় উদ্ভাসিত ক'রে তোলো। আজ আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখাও রাজা জটাধরকে। দেখাও মেহারের আপামর জনসাধারণকে।

তথাস্তু, বৎস। তথাস্তু!

দেবী অন্তর্ধান করলেন।

সেদিন অমাবস্যা রজনীর শেষ যামে মেহারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবিস্ময়ে দেখলো, হ্যাঁ, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ বিরাজ করছে। পূর্ণিমার রজত জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়েছে সারা মেহার অঞ্চল।

রাজা জটাধরও দেখলেন এই অলৌকিক লীলা। প্রত্যক্ষ করলেন অমাবস্যা রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের উদয়।

মুহূর্তের মধ্যে সর্বানন্দের সাধনা ও সর্ববিদ্যা সিদ্ধির কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হ'য়ে পড়লো। প্রচারিত হ'য়ে পড়লো, মূর্খ সর্বানন্দ মহামায়ার প্রভাবে একদিনেই অসাধারণ পণ্ডিত হয়েছেন। একথাও প্রচারিত হোলো, সর্বানন্দ দেবীর প্রিয় পুত্র। প্রিয় পুত্রের মুখ-নিঃসৃত বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। অমোঘ প্রভাব তার। অমেয় তার শক্তি।

জটাধরও শুনলেন সব। তিনি অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা চাইলেন সর্বানন্দের কাছে।

একজন শক্তিধর মহাসাধক ব'লে সর্বানন্দের খ্যাতি চতুর্দিকে

ছড়িয়ে পড়লো। মেহারের রাজা জটাধর সর্বানন্দকে অশেষ সম্মান দেখিয়ে রাজসভায় আনলেন।

দিন যায়।

ঠাকুর সর্বানন্দের প্রভাব, মর্যাদা খুবই বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

এত প্রভাব প্রতিপত্তির মধ্যে থেকেও ঠাকুর সর্বানন্দ উদাসীনভাবে দিন কাটাতে লাগলেন।

রাজা জটাধর পশ্চিম অঞ্চল থেকে কয়েকখানা বহুমূল্য শাল আনিয়েছেন। তার একখানা দিলেন সর্বানন্দ ঠাকুরকে।

ঠাকুর শালখানি কাঁধে নিয়ে বাড়ী আসছেন।

পথে এক বারাঙ্গনা ঠাকুর সর্বানন্দের কাঁধের শালখানি দেখতে পেলো। সে আবদার ধরলো।

বাঃ। বাবা ঠাকুরের শালখানি দেখছি ভা-রী সুন্দব। আমাদের মত মেয়েছেলের বরাতে কি আর এমন শাল কোনও দিন জুটবে? শীত তো, বাবা ঠাকুর, আমাদেরও কবে।

তা বেশ তো। ইচ্ছে যখন হয়েছে তোমার, নিয়ে নাও এখানা।

শালখানি তক্ষুনি দিয়ে দিলেন সেই বারাঙ্গনাকে।

নিমেষে এই সংবাদ চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়লো—রাজার দেওয়া দামী শাল সর্বানন্দ ঠাকুর এক বারাঙ্গনাকে দান ক'রে এসেছেন।

বাজা জটাধর শুনতে পেলেন এই কথা। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তক্ষুনি লোক পাঠিয়ে ডেকে আনলেন ঠাকুর সর্বানন্দকে।

ঠাকুর মশাই, আপনাকে যে শালখানা দিয়েছিলাম, সেখানা কোথায়?

কোনও কিছু না ভেবে ঠাকুর বলে ফেললেন, কেন? শালখানা তো আমার গৃহিণীর কাছে রয়েছে। ঘরে-ই আছে।

এই বুঝি আপনার সত্য কথা বলা? সত্যনিষ্ঠা? ঠাকুর মশাই, লুকোবেন না। মিছে কথা বলবেন না। আমি সব-ই জানতে পেরেছি।

আচ্ছা, বেশ। আপনি যখন বলছেন, শালখানা ঘরেই আছে। দেখা যাক, আপনার কথা কত দূর সত্য। পরীক্ষা এখনই হ'য়ে যাক। আপনি এক্ষুনি শালখানা আনিয়ে দিন তো।

মায়ের দেখা পাবার পর থেকে ঠাকুর সর্বানন্দ যেন হ'য়ে পড়েছেন মায়ের কোলের ছোট্ট ছেলেটি। মায়ের উপর সব-ই ছেড়ে দিয়েছেন। যা করেন—মা। যা বলান—মা।

কেন যে এই কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলো, ঠাকুর তা নিজেই বুঝতে পারছেন না। মনে হোলো, কে যেন অন্তর থেকে এই কথাটা বলিয়ে দিল।

ঠাকুর মাকে স্মরণ করলেন।

ভাগনে ষড়ানন ছিলেন পাশে। তাঁকে বললেন,

ষড়ানন, একবার বাড়ী যা। এক্ষুনি। তোর মামীর কাছ থেকে নিয়ে আয় তো নোতুন শালখানা।

ষড়ানন বাড়ী গেলেন শাল আনতে।

বাড়ী পৌছেই মামীমাকে ডাকতে লাগলেন,

মামী, মামী! মামার নোতুন শালখানা দাও। এক্ষুনি চাই। খুবই দরকার।

মামী বাড়ী নেই। গিয়েছেন অন্য কোথাও।

শাল দিলে না মামী? —ষড়ানন চেঁচাতে লাগলেন।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেলো। দেখা গেলো এক জোড়া হাত। হাতের রঙ যেন চাঁপা ফুলের মতো। তা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিব্য জ্যোতি। মুহূর্তের মধ্যে একখানি শাল ষড়াননের হাতের উপর ফেলে হাত দু'খানি কোথায় মিলিয়ে গেলো।

এ হাত তো মামীর হাত নয়! তবে? ষড়ানন বিস্মিত হলেন।

মামী, মামী!—চেঁচিয়ে উঠলেন ষড়ানন।

শালখানি নিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। মামী সেখানে নেই।

তবে শালখানি কে দিল তাঁকে?

ইতিমধ্যে মামী ফিরে এসেছেন।

সব শুনলেন তিনি। শালখানা দেখলেন। মামী অবাক হ'য়ে গেলেন।

শালের খবর তিনি কিছুই জানেন না। তা'ছাড়া, তিনি তো ঘরেই ছিলেন না।

ষড়ানন বুঝলেন, এ মহামায়ার লীলা। আর কিছুই নয়। আদরের ছুলাল সর্বানন্দকে বাঁচাতে, তাঁব মান রাখতে, তিনি এই অলৌকিক কাজ করলেন।

ষড়ানন কেঁদে ফেললেন। মা, মাগো! এত করুণা তোমার মামার 'পরে! মামাকে তুমি এত ভালোবাসো!

শাল নিয়ে এলেন ষড়ানন।

ইতিমধ্যে রাজা জটাধর লোক পাঠিয়ে সেই বারাঙ্গনার বাড়ী থেকেও শালখানা আনিয়েছেন।

কিন্তু এ কী অলৌকিক ব্যাপার! ছু'খানা শাল অবিকল এক-ই রকম! একটুও তাবতম্য নেই!

জটাধর ঠিক করতে পারলেন না, কোন শালখানি তিনি ঠাকুরকে দিয়েছিলেন।

তিনি সব-ই বুঝলেন। তাঁর চৈতন্ত হোলো। ঠাকুর সর্বানন্দের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

ঠাকুর সর্বানন্দের ছুই চোখে জলের ধারা। তিনি মাকে প্রণাম কবলেন। মা মা!

ঠাকুর সর্বানন্দের আর মেহারে থাকতে ইচ্ছা রইলো না। বিশেষ ক'রে এই ঘটনার পর। তিনি স্থির করলেন, কাশীধামে গিয়ে বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন।

স্ত্রী কেঁদে ফেললেন।

ঠাকুর সর্বানন্দ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

তুমি তো শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে গো। তোমার আবার ভাবনা কিসের?

বাস্তবিকই স্ত্রী অনতিবিলম্বে দেহত্যাগ করেছিলেন।

পুত্র শিবনাথও কাঁদছিলেন।

ঠাকুর তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁকে শক্তি-সাধনার সিদ্ধ মন্ত্র দান করলেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে সর্বানন্দ মেহার ত্যাগ করলেন।

কাশী যাবার পথে তিনি এলেন বর্তমান বাঙ্গলা দেশের খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে।

চন্দ্রচূড় আগমবাগীশ একজন খ্যাতনামা তান্ত্রিক সাধক। তাঁর নিবাস তখন সেনহাটিতে। আগমবাগীশের গৃহে বহু তন্ত্রগ্রন্থ রয়েছে। এ খবর জানতেন ঠাকুর সর্বানন্দ।

ঠাকুর ঠিক করলেন, সেনহাটিতে আগমবাগীশের গৃহে কিছুকাল থেকে গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন ক'রে ফেলবেন। অধ্যয়ন করবেন আগমবাগীশের কাছেই। তাই ঠাকুর সর্বানন্দ আগমবাগীশের গৃহেই আশ্রয় নিলেন। সেখানে রইলেন ছদ্মবেশে। সর্বানন্দ নামে নয়।

ঠাকুর সর্বানন্দের সঙ্গে রইলেন পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন।

একদিন চাঁচড়ার রাজসভায় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এলেন।

তিনি চাইলেন আগমবাগীশের সঙ্গে বিচারে বসতে। আগমবাগীশ তখন চাঁচড়া-রাজের দ্বারপণ্ডিত।

আগমবাগীশ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি কিছুটা ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়লেন। মান সম্ভ্রম নষ্ট হয় বুঝি!

ঠাকুর সর্বানন্দ সেটা লক্ষ্য করলেন।

তিনি আগমবাগীশের কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত জেনে নিলেন। প্রার্থনা করলেন তাঁর কাছে, রাজসভায় আপনার যেতে হবে না। আমি আপনার শিষ্য। আমিই আপনার পক্ষ হ'য়ে সেখানে যাবো। বিচারে নামবো। আপনি আমায় অনুমতি দিন।

ঠাকুর সর্বানন্দ অনেক ব'লে ক'য়ে আগমবাগীশকে রাজী করালেন। তিনি চাঁচড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

সেই দিন রাত্রে বিদেশী পণ্ডিত স্বপ্ন দেখলেন। মহামায়া তাঁকে বলছেন,

পণ্ডিত, আগমবাগীশের যে শিষ্য আসছেন তোমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে, সে কে জান? সে হোলো সর্বানন্দ। —মেহারের সর্বানন্দ। তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে চাও? সে যে একজন সিদ্ধ পুরুষ। সে আমার কৃপালাভ ক'রে সর্ব বিদ্যায় পারঙ্গম হয়েছে। তাকে তুমি কিছুতেই পরাজিত করতে পারবে না। তুমি নিরস্ত হও।

পণ্ডিতপ্রবর সঙ্গে সঙ্গেই চাঁচড়া ত্যাগ করলেন। যাবার আগে প্রকাশ ক'রে গেলেন, আগমবাগীশের শিষ্য আর কেউ নয়, স্বয়ং সর্বানন্দ। তাঁর সঙ্গে তর্ক করা বাতুলতা।

আগমবাগীশ এ কথা শুনলেন।

এতকাল মহাসাধক সর্ববিদ্যাবিশারদ ঠাকুর সর্বানন্দ তাঁর গৃহেই রয়েছেন। তিনি বিস্মিত হলেন। পুলকিত-ও হলেন।

দিন যায়।

আগমবাগীশের মনে এক চিন্তা এলো, সর্বানন্দকে কী ক'রে স্থায়িভাবে গৃহে রাখা যায়।

তিনি একদিন সর্বানন্দকে ডেকে আশীর্বাদ করলেন।

তুমি দীর্ঘজীবী হও, বৎস। তুমি সর্বত্র জয়ী হও।

ঠাকুর বললেন, আমি আজ কৃতার্থ। আমি আজ আপনার আশীর্বাদ লাভ করলাম। আপনার গৃহে থেকে আগমশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিও অধ্যয়ন করবার সুযোগ পেলাম। এইবার আমাকে বিদায় দিন, গুরুদেব। আমি কাশীধামে যাই।

বৎস, এতদিন আমাকে আচার্য ব'লে মেনে এসেছো। কিন্তু গুরুদক্ষিণা তো এখনও দাও নি!

বলুন গুরুদেব, কি দক্ষিণা দেব?

তুমি আমার কন্যা স্বয়ংপ্রভাকে গ্রহণ করো। সে তোমার অযোগ্যা হবে না, বাবা। তুমি সম্মত হলেই আমায় গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।

মহাপরীক্ষায় পড়লেন ঠাকুর সর্বানন্দ। অনেক ভেবেচিন্তে বিবাহ করতে তিনি সম্মত হলেন।

আগমবাগীশ বললেন, তুমি এখানে থেকেই তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ লেখো। এখানে থাকলে তোমার সুবিধা-ই হবে।

সেনহাটি থেকেই ঠাকুর সর্বানন্দ সর্বোল্লাসতন্ত্র বইখানি রচনা করলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের এ একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

সেনহাটি থাকা কালে সর্বানন্দ ঠাকুরের একটি পুত্র হয়।

কয়েক বৎসর সেনহাটিতে থেকে ঠাকুর সর্বানন্দ কাশীধামে রওনা হলেন। পূর্ণানন্দ তখনও বেঁচে। তিনি ও ষড়ানন সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

ঠাকুর সর্বানন্দ কাশী এলেন।

কাশীর গণেশ মহল্লার সারদামঠে ঠাকুর সর্বানন্দ বাস করতে লাগলেন। এখানেই তিনি দেবী ভদ্রকালীর দর্শন লাভে ধন্য হন।

ঠাকুর সর্বানন্দ মাছ মাংস মদ এই সব দিয়ে মায়ের আরাধনা করতেন। এই জন্যে কাশীর শৈব ও দণ্ডী সন্ন্যাসীরা তাঁর উপর খুবই ক্ষিপ্ত হলেন। তাঁরা ঠাকুর সর্বানন্দকে কাশী থেকে তাড়াবার ষড়যন্ত্র করলেন।

ঠাকুর সর্বানন্দের উপর নানাভাবে অত্যাচার চলতে লাগলো।

ঠাকুর তাঁর শক্তি বিভূতি দেখাতে শুরু করলেন।

যখনই উগ্রপন্থীরা সর্বানন্দ ঠাকুরের উপর অত্যাচার করতেন, তখনই আহারে বসলে তাঁদের খাদ্যে পড়তো মাছ, মাংস, মদ, এই-সব। শেষে সবাই বুঝলেন, এ-সব ঠাকুর সর্বানন্দের শক্তিতেই সম্ভব হচ্ছে। তাঁরা নিরস্ত হলেন।

ঠাকুর সর্বানন্দের খ্যাতি বেড়ে গেলো। সবাই তাঁকে চিনলেন অবধূত মহারাজ নামে।

কাশীধামে ঠাকুর সর্বানন্দ কতদিন ছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি। শেষ জীবনে তিনি বদরিকাশ্রমের দিকে রওনা হন। কাশ্মীরেও নাকি ছিলেন কিছুকাল। এর পর তাঁর সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়।

ভারতে তন্ত্রসাধনার একনিষ্ঠ প্রচারক, মহাসাধক তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের দীক্ষিত শিষ্য, বহু তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা, কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সার জন উড্‌রফ ঠাকুর সর্বানন্দের শেষ জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন—

জনশ্রুতি এই যে সর্বানন্দ এখনও বেঁচে রয়েছেন।—এই কয়েকশ' বছরের ব্যবধান স্বত্ত্বেও। কায়ব্যূহ যোগাভ্যাসের সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। সিদ্ধ সাধকদের বাসস্থান কোনও গুপ্ত পবিত্র সাধন-পীঠে তিনি এখনও রয়েছেন।

আমার জনৈক বিশিষ্ট সংবাদদাতার সঙ্গে এক বিশেষ সিদ্ধ মহাত্মার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই সিদ্ধ মহাত্মা তাঁকে জানিয়েছেন, কিছুকাল আগেও চম্পকারণ্যে ক্রমাগত কয়েকমাস যাবত মহাতান্ত্রিক সাধক সর্বানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। এর পর পূর্বোক্ত সিদ্ধমহাত্মা অন্যস্থানে চ'লে যান। কাজেই ঠাকুর সর্বানন্দের আর কোনও সংবাদ তাঁর পক্ষে রাখা সম্ভব হয় নি।

ঠাকুর সর্বানন্দ কয়েকখানা তন্ত্রের বই লিখেছেন।

এদের মধ্যে সর্বোল্লাসতন্ত্র, শ্রীবিদ্যার্চন চন্দ্রিকা, বৃহন্নবান্ন পদ্ধতি বিখ্যাত। বৃহন্নবান্ন পদ্ধতি বইখানি নাকি কাশ্মীরে থাকাকালীন রচিত।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে এখানে উৎসব হ'য়ে

থাকে। তখন অগণিত লোক এখানে আসেন দেশের নানাস্থান থেকে।

একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতো।

মেহারের সাধনপীঠের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বহু বড় বড় গাছ রয়েছে। তার উপর অসংখ্য শকুনি এসে বসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এত বছরের মধ্যে কেউ-ই কোনও পাখীর মল দেখেনি এই পবিত্র স্থানে সাধনপীঠ কলুষিত হয় নি।

মেহার কালীবাড়ী চাঁদপুর—চট্টগ্রাম রেলপথে একটি স্টেশন। স্টেশনের সন্নিকটেই সাধনপীঠ।

মেহার বর্তমান বাঙ্গলা দেশের কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম।

———

দেবী রাজবল্লভী

রাজবলহাট।

একদিকে দামোদর, অন্যদিকে রণ নদ রাজবলহাটকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন ক'রে আছে।

হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে হরিপাল স্টেশনে নেমে মোটর-বাসে রাজবলহাটে যেতে হয়।

রাজবলহাট হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ জনপদ, বর্ধিষ্ণু গঞ্জ। খ্যাতি এর বহু-বিস্তৃত।

রাজবলহাট তাঁতের কাপড়ের জন্যে খ্যাতি লাভ করেছে। কয়েক হাজার নরনারী তাঁতের কাজে নিযুক্ত। এখানে ওখানে সর্বত্রই তাঁতের ঠকাঠক শব্দ। যাঁরা তাঁতী নন, যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের মধ্যেও অনেকে, তাঁতের কাজ করেন। দূর-দূরান্তর থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন তাঁতের কাপড় কিনতে।

জন-সাধারণের কাছে, ধর্মপিপাসুদের কাছে রাজবলহাট বিখ্যাত কিন্তু আর এক কারণে।

এখানে দেবী রাজবল্লভী বিরাজ করছেন। তাঁরা বলেন, রাজবল্লভী বড় জাগ্রতা দেবী।

স্থানীয় লোকেরা বলেন. রাজবল্লভীর কাছে আকুল প্রাণে মনের কথা জানালে তিনি তা শোনেন। তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

দেশ দেশান্তর থেকেও বহু পুণ্যকামী এখানে আসেন দেবীকে দর্শন করতে, তাঁকে পুজো করতে।

মহা-আড়ম্বরে দুর্গাপুজার তিন দিন এখানে দেবী রাজবল্লভীর পুজো হয়। তবে আড়ম্বরের ঘটা বেশী নবমী পুজোর দিনে। সেদিন এখানে অসংখ্য লোকের ভীড়।

দেবী রাজবল্লভীর নাম অনুসারেই এই জনপদের নাম রাজবলহাট।

রাজবলহাট।

আগে এই অঞ্চল ভুরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট রাজের অধীনে ছিল।

ভুরি অর্থে বহু। বহু শ্রেষ্ঠী বা বণিকের বাসভূমি। তাই এর নাম ভুরিশ্রেষ্ঠ। এরই অপভ্রংশ ভুরস্তট।

সে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা।

ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজা তখন সদানন্দ রায়।

প্রবল তাঁর প্রতাপ। বহুদূরবিস্তৃত তাঁর নাম।

তিনি বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চল পরিষ্কার ক'রে নগর বসালেন। নগরে একটা হাটেরও পত্তন করলেন তিনি। রাজার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে এই নগরকে রাজপুরও বলতো।

বেশ কিছুদিন পরের কথা।

এই বংশেরই আর এক রাজা।

তিনি এই রাজপুরে খনন করালেন বিশাল এক দীঘি। দীঘির নাম রাখলেন কমলদীঘি।

অচিরে কমলদীঘি জলে পূর্ণ হোলো। একেবারে টইটুম্বুর। বেলে মাটির দেশ। দীঘির জল হোলো স্বচ্ছ, নির্মল।

দীঘির ঘাটে বসেন রাজা ও রাণী। জলে তাঁদের ছায়া পড়ে। বেশ পরিষ্কার তা' দেখা যায়। জলে রক্ত কুমুদ, শ্বেত কুমুদ।

রাজা দীঘি দেখে, তার জল দেখে, সুখী হলেন।

এমন মনোহর দীঘি! এর পাশে সুন্দর একটা ফুলের বাগান হ'লে মানানসই হোতো। ভালো হোতো।

ভালো হোতো, তা করতে বাধা কোথায়?

অচিরেই তৈরী হোলো সুন্দর, নয়ন-মোহন একটি ফুলবাগিচা। নানারকমের অজস্র ফুলের সমারোহ সেখানে।

রাণীর আরাধ্য-দেবতা হলেন গৌরী।

রাণী বড় ভক্তিমতী। তিনি নিত্য গৌরী দেবীর পূজো করেন। পূজোর ফুল আসে এই ফুল বাগিচা থেকে।

ভোরে উঠে স্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে মালিনী এই ফুল বাগিচায় এসে ফুল তোলেন।

রাণী সেই ফুলেই পূজো করেন গৌরী দেবীর।

মালিনীর এ নিত্যকার কাজ।—এই ফুল তোলা।

সেদিনও মালিনী ফুল তুলছেন।

হঠাৎ সেখানে এলেন এক ব্রাহ্মণ-কন্যা।

আমায় কিছু ফুল দাও না। খুব সুন্দর ফুল।

ও মা, সে কী কথা! চুপ, চুপ। রাণীমা শুনতে পাবেন। একথা বারেকও আর মুখে এনো না।

কেন, কি হয়েছে?

জান না?—এ যে রাণীমার পূজোর ফুল। তিনি এই ফুল দিয়ে গৌরী দেবীর পূজো করবেন।

তাতে কি হোলো? বড় ভালো ফুল। দাও না আমায় কয়েকটা।

চুপ।—দুই ঠোটে আঙুল দিলেন মালিনী।

এ কথা শুনতে পেলে রাণীমা রেগে যাবেন। তোমায় আমায় দুজনকেই শাস্তি দেবেন। আর বোলো না এমন কথা।

তুমি ফুল দাও। তোমার কোনও ভয় নেই। আমায় ফুল দিলে রাণীমা তোমায় বকবেন না। খুসীই হবেন তোমার 'পরে। রাণীমা তোমায় কিছু বললে, বলবে, গৌরীদেবীর বড় বোন রাজবল্লভী ফুল নিয়েছেন। এই কথায় যদি তাঁর বিশ্বাস না হয়, রাণী যদি তার পরেও তোমার পরে রাগ করেন, তবে আমি গৌরীকে সরিয়ে তার জায়গায় নিজেই গিয়ে বসবো। পূজো নেবো তোমার রাণীমার কাছ থেকে রোজ রোজ।

ও মা এ কী সর্বনেশে কথা! বামুনের মেয়ের মুখে এ কী অলুক্ষুণে কথা!

মালিনী শিউরে উঠলেন। ভয়ে চোখ বুজলেন।

কিছুক্ষণ বাদে চোখ মেললেন মালিনী।

কিন্তু এ কী! তাঁর সামনে ইনি কে? এ যে আর এক দেবী-মূর্তি! ইনিই কি তবে রাজবল্লভী?

গায়ের রঙ শরৎকালের জ্যোৎস্নার মতো। ডান হাতে রয়েছে একখানা ছুরি। বাঁ হাতে রক্তের পাত্র।

মালিনী তাকিয়েই রইলেন। দেখতে লাগলেন দেবীকে, শেষে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মা, মাগো, আমার অপরাধ ক্ষমা করো!

রাজাও সেইদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন।

রাজবল্লভী তাঁকে বলছেন,

আমি রাজপুরে চলছি। সেখানে ঘটা ক'রে আমার প্রতিষ্ঠা করবে। রোজ পূজোর ব্যবস্থা করবে। আর, 'নিশী পোহাইলে নাম রাখ নগরীর'। আজ থেকে আমার নামে নগরের নাম রাখবে রাজবল্লভীহাট।

দেবী রাজবল্লভী আর মহাহাট।
এই যুগ্ম নাম রাখ রাজবল্লভীহাট ॥

রাজবল্লভীহাট থেকে ধীরে ধীরে এসে পড়লো রাজবলহাট নাম।

ষোড়শ শতকে রাজা রুদ্রনারায়ণ রাজবল্লভী দেবীর মন্দির পুনর্নির্মাণ করলেন মহা আড়ম্বর ক'রে।

কেউ কেউ বলেন, না, এ কাহিনী নয়।

রাজবল্লভী দেবীর আবির্ভাবের কাহিনী অন্য।

জান না ?—সেই বণিক ও ব্রাহ্মণ পরিচারিকার কাহিনী ?

সেই কাহিনীটিই তো জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ লোক তো সেই কাহিনীই সত্য বলে মেনে চলেছেন।

সেই কাহিনী অবলম্বন ক'রে এখনও পূজোর ব্যবস্থা হয়। পূজো শুরু করা হয়।

দেবী রাজবল্লভী। রাজবলহাট।

রাজবল্লভী এলেন এখানে। এই রাজবলহাটে। এলেন এক ব্রাহ্মণ পরিচারিকার বেশ ধ'রে।

এক সুখী পরিবার। বড়ই ভক্তিমান সকলে। পূজো-অর্চনা নিয়েই থাকেন সকলে।

পরিবারের কেউ মিথ্যে কথার ধার দিয়েও যান না। প্রতারণা, ফন্দী ফিকির কাকে বলে কেউ জানেন না। গাঁয়ের সবাই এঁদের ভক্তি করে। মান্য করে।

দেবী রাজবল্লভী এই পরিবারেই এলেন। এলেন পরিচারিকার কাজ নিয়ে। জগতে প্রচার করতে পুণ্যের প্রভাব। ধর্মের মাহাত্ম্য।

যাঁরা পুণ্যবান, যাঁরা ভক্তিমান, দেবী তাঁদের দাসী। হোন না তিনি জগতের ঈশ্বরী। তবুও অকলঙ্ক পুণ্যময় নরনারীর দাসী হ'তেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন না।

দেবী এলেন এই পরিবারে। পরিচারিকার কাজ করেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যার বেশ নিয়ে তিনি থাকেন।

অল্প বয়স। রূপের তুলনা নেই তাঁর। তিন ভুবন মুগ্ধ হ'য়ে যায় যে রূপ দেখে, এ ঠিক তেমন রূপ।—ত্রিলোক-মনোমোহিনী।

বাড়ীর ঠিক পাশ দিয়ে দামোদর ব'য়ে চলেছে।

সে সময়ে এই দামোদর দিয়ে বহু বাণিজ্য তরী যেতো। যেতো দেশবিদেশের বহু বণিক। কেউ বা যেতো সপ্তডিঙ্গা সাজিয়ে।

ক্ষমা কর, মা। ক্ষমা কর। আমি পাপী। আমি নরাধম। আমাকে ক্ষমা কর।

দেবী তুষ্ট হলেন। ক্ষমা করলেন বণিককে।

সঙ্গে সঙ্গেই একখানি একখানি ক'রে ছয়খানি বজরাই ভেসে উঠলো। সব জিনিসই রয়েছে অক্ষত।

দেবী রাজবল্লভী বললেন,

বৎস, ঠিক এইখানেই আমায় প্রতিষ্ঠিত করো। আমায় নিত্য পূজো দেবার ব্যবস্থা করো।

তাই করবো মা। তাই করবো।

যে আমার এই রূপ দেখবে, সেই-ই সতর্ক হবে পরনারীর রূপলালসা থেকে। ভক্তিভাবে আমাকে দর্শন করলে, নিমেষে তার সকল কলুষ বিদূরিত হবে।

বণিক ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন।

সম্বিৎ ফিরে পেলে মা, মা আর্তনাদে সর্বাঙ্গ সিক্ত করে ফেললেন।

বণিক দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রতিষ্ঠিত করলেন দেবী রাজবল্লভীকে।—রাজবলহাটে।

সেইদিন থেকে দেবী-পূজা অব্যাহতভাবে চ'লে আসছে।

প্রতি বছর অষ্টমী পূজোর আগে সাতটি ছোট ছোট ডিঙ্গা তৈরী ক'রে মায়ের দীঘিতে ছয়টি ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

এর পরে আরম্ভ হয় পূজো সাড়ম্বরে।

তাইতো মনে হয়, দ্বিতীয় কিংবদন্তীটি আজ অবধি পূজোর অঙ্গ রয়েছে।

আগে মহানবমীর দিন মোষ বলিদান হোতো।

দেবীর বাঁ দিকের দীপশিখা সেই দিন পূজোর পর সোজা হ'য়ে যায়। এখনও এমনটি হয়।

•

দেবীর রূপ বর্ণনা রয়েছে রাজবল্লভী মাহাত্ম্যে।

মন্দিরে শোভিছে মাতা শ্রীরাজবল্লভী।
শরৎ জ্যোৎস্নাপ্রভা বিশালা ভৈরবী॥
বিল্বমালা গলে, ছুরিধৃত ডান হাতে।
প্রসারিত বাম হস্তে পাত্র শোভে তাতে।
রণ-রঙ্গিণীর মূর্তি—ভীমা সুনয়না।
বরাভয় প্রদায়িনী, প্রসন্ন আননা॥
উজ্জ্বল মুকুট শিরে ত্রিলোক জননী।
শিব বক্ষে শব শিরে চরণ ধারিণী॥

এত বড় বিগ্রহ সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। দেবী-বিগ্রহের উচ্চতা ছয় ফুট। দেবীর বাম হাতে রুধির পাত্র। ডান হাতে ছুরিকা। তাঁর ডান পা মহাকাল ভৈরবের বক্ষে। আর, বাঁ পা বিরূপাক্ষ মহাদেবের মস্তকে রক্ষিত।

এমন অপূর্ব আর অভিনব মূর্তি বাঙ্গলা দেশের আর কোথাও আছে কিনা জানি নে।

দেবী রাজবল্লভী চণ্ডীরই রূপান্তর ব'লে মনে হয়।

পীঠ নির্ণয় গ্রন্থে রাজবলহাটকে একটি শক্তি পীঠ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বলা হয়েছে চণ্ডী।

———

কৃষ্ণদাস বাবাজী

শ্রীবৃন্দাবন।

চুরাশী ক্রোশ-ব্যাপ্ত ব্রজমণ্ডলের কেন্দ্রপীঠ বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিকেতন বৃন্দাবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বৃন্দাবন।

বর্ষাণ।

বর্ষাণ ব্রজমণ্ডলেরই অন্তর্গত। এক সময়ে বৃষভানু রাজার রাজধানী ছিল। শ্রীমতী রাধা হলেন বৃষভানুনন্দিনী।

বর্ষাণ শ্রীরাধারাণীর জন্মস্থান ও লীলাবিলাসক্ষেত্র।

ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ উপবনের একটি বর্ষাণ। তিনটি গিরির মধ্যেও একটি হোলো বর্ষাণ।

বর্ষাণের অনতিদূরে রণবাড়ী।

এই রণবাড়ীতে এক সময়ে কৃষ্ণদাস বাবাজী সাধনা করতেন। শ্রীরাধাগোবিন্দগত প্রাণ ছিলেন এই কৃষ্ণদাস বাবাজী।

রণবাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা . সবাই কৃষ্ণদাসকে দ্বিতীয় ঈশ্বর বলেই জানতো। কৃষ্ণদাসের আশীর্বাদ লাভ করতে পারলে সবাই নিজেদের কৃতার্থ মনে করতো। সবাই নিজ নিজ সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদের কথা কৃষ্ণদাসকে জানিয়ে নিশ্চিন্ত হোতো। জানিয়ে সবাই শান্তি পেতো। সবার-ই তিনি আপন জন। এখনও ওই অঞ্চলের লোকেরা তাঁর নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তাঁর নাম শুনলেই যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানায়।

এই কৃষ্ণদাস। রণবাড়ীর কৃষ্ণদাস বাবাজী।

কৃষ্ণদাসের বাল্যজীবনের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

কৃষ্ণপ্রসাদের জন্ম যশোর জেলার মহম্মদপুরে। মহম্মদপুর ইতিহাস-খ্যাত রাজা সীতারামের জন্মস্থান।

গোকুলচন্দ্র সীতারামের ইষ্টবিগ্রহ হরেকৃষ্ণ রায়ের সেবাইত ছিলেন। বালক বয়স থেকেই এই হরেকৃষ্ণের সেবায় তন্ময় থাকতেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

বয়স বাড়তে লাগলো।

কৃষ্ণপ্রসাদ লেখাপড়া কবেন। সংসারের কাজকর্মের দিকেও দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু বেশী মনোযোগ বিগ্রহ-সেবার দিকেই।

শিশুকাল থেকেই সঙ্কল্প করেছেন কৃষ্ণপ্রসাদ, সারাটি জীবন একনিষ্ঠ হ'য়ে ইষ্টদেবের আরাধনায় কাল কাটাবেন। কাটাবেন দিনেব সাবাক্ষণ তাঁব ধ্যানে, তাঁর পূজা-অর্চনায়, তাঁর নাম গানে।

সেইভাবেই দিন চলছিল।

অকস্মাৎ একদিন কৃষ্ণপ্রসাদের বিবাহের প্রস্তাব এলো।

বিবাহ? সংসাবে আসক্তি-বৃদ্ধি? এ যে সংসার-জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন!

আতঙ্কে শিউরে উঠলেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

বিবাহের প্রস্তাব যেদিন এলো সেইদিনই রাত্রের ঘন অন্ধকারে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন—পালালেন।

কোথায় যাবেন? কেন? শ্রীবৃন্দাবনে। আবাল্যের স্বপ্ন, তাঁর ইষ্টদেবের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনেই চললেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

কিন্তু যাবেন কি ক'রে? সম্বল যে কানাকড়িও নেই। সংসারের গুরুজনদের না জানিয়েই যখন চলেছেন, তখন তো সংসারের একটি কপর্দকও নেওয়া সঙ্গত নয়। নিলে তো প্রকারান্তরে চুরি করার-ই সামিল হবে।

না-ই বা থাকলো পথের সম্বল—টাকাকড়ি।

প্রকৃত সম্বল কৃষ্ণনাম করতে করতেই কৃষ্ণপ্রসাদ পা বাড়ালেন। পায়ে হেঁটেই চললেন বৃন্দাবনে।

মুখে শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ!

ক্লেশনাশন কৃষ্ণের নাম নিয়ত যাঁর মুখে তাঁর আবার পথক্লেশ ? পথকষ্ট ?

কৃষ্ণপ্রসাদ কৃষ্ণ নাম জপতে জপতেই শ্রীবৃন্দাবনে এসে পৌছলেন। এসেই লুটিয়ে পড়লেন বৃন্দাবনের রজে।

এতদিনে এলাম প্রভু। আমাকে ঠাঁই দাও।

চোখের জল অবাধে ছুটলো।

বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণপ্রসাদ রইলেন অনতিদূরে বর্ষাণে। এইখানেই সদগুরুর কৃপালাভ হোলো। কৃষ্ণপ্রসাদ দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছে।

গুরুদেব নাম রাখলেন কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণপ্রসাদ রূপান্তরিত হলেন কৃষ্ণদাসে।

একটানা বারো বছর কেটে গেলো গুরুর সান্নিধ্যে বর্ষাণে। এই বারো বছর একনিষ্ঠ হ'য়ে তিনি গুরুদেবের সেবা করলেন।

একদিন গুরুদেব আদেশ করলেন, বৎস কৃষ্ণদাস, এখন একবার তোমার জন্মভূমি দর্শন ক'রে এসো। গর্ভধারিণী জননীকে প্রণাম ক'রে এসো। লাভ ক'রে এসো তাঁর আশীর্বাদ। জেনো বৎস, জননীর আশীর্বাদ পরম ইষ্ট-লাভে সর্বাধিক সাহায্য করে।

দ্বিরুক্তি নয়। গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে কৃষ্ণদাস তক্ষুনি চলে এলেন মহম্মদপুরে।

দেবোপম কান্তি। জ্যোতির্ময় রূপ। মুণ্ডিত মস্তক। গলায় তুলসীর মালা। কৌপীন-সম্বল কৃষ্ণদাসকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে, সবাই মুগ্ধ হোলো। এমন কি বয়স্ক গুরুজনরাও।

একজন প্রকৃত বৈষ্ণব। অহঙ্কার নেই। অভিমান নেই। দীনতার যেন প্রতিমূর্তি। —সবাই বলাবলি করে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটি জান তো ?

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু তো এই কথাই যেন আবার বলেছেন।—

উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেই কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥

আমাদের কৃষ্ণদাসকে দেখেও এইসব কথা মনে পড়ছে।

আমাদের পরম ভাগ্য, এমন বৈষ্ণব আমাদেরই ছেলে, আমাদেরই গাঁয়ের ছেলে।

মহাপ্রভুর শরণাগত কৃষ্ণদাসের কথা সকলেরই মুখে মুখে।

কতদিন আগেকার কথা!

এখনও কিন্তু মহম্মদপুরের লোকেরা কৃষ্ণদাসের কথা বলে।

কৃষ্ণদাসের বাল্যের সে মন্দির এখন নেই। সেই হরেকৃষ্ণ বিগ্রহও নেই।

কৃষ্ণদাসের নাম কিন্তু মহম্মদপুরে এখনও রয়েছে।

মাধব ঘোষ। মহম্মদপুরেই বাড়ী।

তিনি কৃষ্ণদাসের চরিত্রে আকৃষ্ট হলেন। যে কয়দিন কৃষ্ণদাস মহম্মদপুরে ছিলেন, তাঁর সেবা করলেন। অষ্টপ্রহর তাঁর সঙ্গ করলেন।

কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন বর্ধাণে। মাধব সঙ্গ ছাড়লেন না তাঁর। বর্ধাণ পর্যন্ত এলেন। থাকলেন তাঁরই

কাছে। বৃদ্ধ বয়সে মাধব বর্ষাণেই দেহ-রক্ষা করলেন। সে ১২৮৩ সালের কথা।

আঘাত লাগলো কৃষ্ণদাসের। তিনি শোক পেলেন।

দীর্ঘ দিনের সহচর, সেবক অপ্রকট হয়েছে। শোক পাবারই কথা।

মনটা প্রায়ই বিষণ্ণ থাকে। এ অবস্থায় কি ঠাকুর সেবা চলে? চলে সাধন-ভজন? তাঁর নাম গান?

যাই। তীর্থ পর্যটন ক'রে আসি।

কৃষ্ণদাস তীর্থ-দর্শনে বেরিয়ে পড়লেন। পরিভ্রমণ করলেন বহু তীর্থ। দর্শন করলেন বহু দেব মন্দির।

এবার মন শান্ত হয়েছে। শোকের লেশমাত্র নেই।

কৃষ্ণদাস ফিরে এলেন বর্ষাণে। শ্রীমতী রাধারাণীর স্মৃতি-বিমণ্ডিত, তাঁর পদরজপূত বর্ষাণে। বড় ভালো লেগেছে বর্ষাণ।

কৃষ্ণদাস বর্ষাণের অনতিদূরে রণবাড়ীতে ভজন কুটির নির্মাণ করলেন।

সেই কুটিরে ব'সে চলে দিবানিশি ভজন। রাধাগোবিন্দের ভজন।

কৃষ্ণদাস রাধাগোবিন্দের নামে প্রেমোন্মত্ত থাকেন সর্বক্ষণ।

এরই ফাঁকে ফাঁকে এক বাসনা উঁকি মারে তাঁর মনের কোণে।

রাধাগোবিন্দের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত, তাঁদের পদরজধন্য ব্রজধামে আমি যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। ব্রজের পবিত্র রজে যেন আমার কলেবর মিশে যায়।

যত দিন যায়, এই বাসনা, এই সাধ প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়। রাধাগোবিন্দ!

কেটে গেলো কিছুকাল।

এক সময়ে কৃষ্ণদাস দ্বারকাধামে গেলেন। দ্বারকাতীর্থের সুমঙ্গল চিহ্ন ধারণ করলেন নিজের অঙ্গে। খুসী হলেন।

দ্বারকায় কিছুদিন থেকে কৃষ্ণদাস ফিরে এলেন রণবাড়ীতে।

একদিন একজন বৈষ্ণব এলেন কৃষ্ণদাসের ভজন কুটিরে।

কৃষ্ণদাস মহাসমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। একসঙ্গে নাম গান চললো। কীর্তনানন্দে কয়েকদিন কাটলো।

একদিন কথায় কথায় বৈষ্ণব বাবাজী কৃষ্ণদাসকে বললেন, বাবাজী, আপনার শ্রীঅঙ্গে দ্বারকাধামের পবিত্র চিহ্ন লক্ষ্য করছি। আমার মনে হয়, আপনার কলেবর শ্রীধাম দ্বারকায়-ই অন্তর্হিত হবে। ব্রজের বজে এ দেহ কৃতার্থ হবে, এমন মনে হয়-না। আপনার বয়স হয়েছে। কখন কি ঘটে, বলা যায় না। আমি মনে করি, এখন আপনার দ্বারকায় গিয়ে সেখানে বাস করাই সমীচীন হবে।

কৃষ্ণদাস শিশুর মতো সরল। বিশ্বাসের ভরা নৌকায় পাল তুলেই তিনি চলেন। অবিশ্বাস তিনি কাউকেই করেন না। করতে জানেন না।

একজন বৈষ্ণব তাঁকে বলেছেন দ্বারকাধামে তাঁর দেহরক্ষা হবে। তিনি এ কথা সত্যি বলেই ধ'রে নিলেন।

নিদারুণ আঘাত পেলেন কৃষ্ণদাস। দুঃখে ও শোকে ভেঙ্গে পড়লেন।

এই ব্রজধামে থেকে, রাধাগোবিন্দ, রাধাগোবিন্দ বলতে বলতে এ দেহ অন্তর্হিত হবে। ব্রজধামের রজকণার সঙ্গে এ দেহ মিশে যাবে। এ ভাগ্য হোলো না? হায় হায়!

কৃষ্ণদাস বড়ই কাতর হ'য়ে পড়লেন। আপন মনে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। আকুল প্রার্থনা।—

হে বৃষভানুনন্দিনি, আমি দীন অভাজন। আমায় নিরাশ কোরো না। আমার মনের সাধ তুমি পূর্ণ করো।

হে গোবিন্দানন্দ-বিবর্ধিনি, তুমি তো কেবল শ্রীগোবিন্দের আনন্দই বৃদ্ধি কর না। নিখিল জনের আনন্দই তুমি বাড়িয়ে চলেছ। এ অধম কি নিখিলজনের বাইরে? এ হতভাগ্যের আনন্দ বৃদ্ধি করবে না?

হে ব্রজমণ্ডলেশ্বরি, ব্রজধামের এই দীন কাঙালকে তুমি ত্যাগ কোরো না। আমি তো চিরটিকাল তোমারই ধ্যান ক'রে এসেছি। তোমাকেই জীবনের সার বলে জেনেছি। তবে আজ এমন কী ত্রুটি করলাম যে তোমার করুণা থেকে বঞ্চিত হবো?

ওগো করুণাময়ি, তোমার করুণায় এই পবিত্র ব্রজমণ্ডলের পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, এমন কি তরুলতা পর্যন্ত পরমানন্দ ভোগ করে। আমি দীন-হীন ব'লে, অনধিকারী ব'লে, আমাকে সেই করুণা থেকে বঞ্চিত কোরো না।

ওগো অন্তর্যামিনি, তুমি তো জানো, আমি যত অপরাধী-ই হই না কেন, তোমার শ্রীচরণকমল আশ্রয় করেই রয়েছি। একমাত্র তোমাকেই সম্বল ক'রে। আমায় যদি তুমি ত্যাগ করো, তবে তোমার শরণাগত-পালিনী নামের যে গৌরব থাকবে না। তুমি নিত্য-ক্ষমাময়ী, আমার সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা করো।

তোমার শ্রীচরণস্পর্শে পবিত্র, ভক্তজন-বাঞ্ছিত! দেবগণেরও একান্ত কাম্য এই ব্রজমণ্ডলের রজে আমাকে ঠাঁই দাও।

আহার গেলো। নিদ্রা গেলো।

শুধু কাতর প্রার্থনা, আর্তস্বরে আকুল প্রার্থনা, ঠাঁই দাও! ব্রজের পবিত্র রজে আমায় ঠাঁই দাও!

চোখের জলে ব্রজের রজ সিক্ত হয়। সে আকুল কাতরতা দেখে সমাগত ভক্তজনের চোখ থেকে জলধারা ছোটে।

শুধু এক কথা—ঠাঁই দাও। ঠাঁই দাও। করুণা কর। আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর।

ভক্তজনেরা আসেন। আসেন বহু গুণমুগ্ধ অনুরক্ত জন। সবাই সান্ত্বনা দেন।

কেন কাতর হচ্ছেন? বাবাজীর কথা যে সত্যি-ই হবে তার কী অকাট্য প্রমাণ আছে? মিথ্যেও তো হ'তে পারে।

না না! শিউরে ওঠেন কৃষ্ণদাস। না না। বৈষ্ণবের কথা মিথ্যে হয় না। হ'তে পারে না।

কৃষ্ণদাসের মুখে একই কথা, একই প্রার্থনা।

ঠাঁই দাও। ব্রজের পবিত্র রজে আমাকে ঠাঁই দাও।

একদিন দুইদিন ক'রে চারদিন কেটে গেলো।

এই চারদিনের মধ্যে বাবাজীর দেহে জরার লক্ষণ দেখা দিল। মাথার সব চুলই একেবারে সাদা হ'য়ে গেলো। দেহ-চর্ম শিথিল হ'য়ে পড়লো। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হোলো। কৃষ্ণদাস তখন যেন একজন অতি বৃদ্ধ, মৃত্যুপথ-যাত্রী। মরণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন।

এ দৃশ্য মর্মান্তিক। দুঃসহ।

সমাগত বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা এসে সমবেতভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন।

নিবৃত্ত হোন বাবাজী। এক গণ্ডুষ জল অন্ততঃ মুখে দিন।

সকলের অনুরোধে রাধাগোবিন্দের পাদোদক এক গণ্ডুষ মাত্র গ্রহণ করলেন কৃষ্ণদাস।

তারপরে ক্ষীণ স্বরে বললেন, উনি যে বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যে হয় না। মিথ্যে হ'তে পারে না। বিশেষ ক'রে, বাবাজী তো রাধাগোবিন্দগত-প্রাণ। উনি পরম ভাগবত। ওঁর কথার অন্যথা হ'তে পারে না। বাবাজী বলেছেন, আমার পক্ষে ব্রজমণ্ডলের রজ-লাভ অসম্ভব। বাবাজী রাধাগোবিন্দের গৌরব। সমগ্র ব্রজমণ্ডলের গৌরব। একজন মহাশক্তিমান বৈষ্ণব। এই জাতীয় পরম বৈষ্ণবের ইচ্ছায়-ই ভগবান গোবিন্দের গতিবিধি। এমন বৈষ্ণবের কথা মিথ্যে হ'তে পারে না। না জানি কোন্ সুত্র ধ'রে নিয়তি এই অধমকে ব্রজমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেবেন! হা গোবিন্দ!

এই ভাবেই পুরো চারদিন কেটে গেলো।

পঞ্চম দিনে ভোর বেলায় সকলে এক অতি আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। অভূতপূর্ব সে দৃশ্য।

কৃষ্ণদাস বাবাজীর পায়ের বুড়ো আঙুল হ'তে সহসা আগুন জ্ব'লে উঠলো। মোমবাতির মতো জ্বলতে লাগলো সে আগুন। জ্বলতে জ্বলতে মোমবাতি যেমন ক্ষয় হয়, কৃষ্ণদাসের পায়ের আগুন সেই রকমই দেহ ক্ষয় ক'রে উপরে উঠতে লাগলো।

অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখতে দলে দলে লোক এসে সেই ভজন কুটিরে সমবেত হোলো।

সবাই দেখেন, সৌম্য শান্ত পুরুষ কৃষ্ণদাস সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে রয়েছেন। মুখে একটুও যন্ত্রণার আভাস নেই। পরিবর্তে আছে প্রসন্নতার ছাপ। আনন্দের আভা।

যখন দেহের গোটা নিম্নাংশ আগুনে পুড়ে গেলো, প্রাণ যখন দেহ ছেড়ে যাবার উপক্রম করলো, চিরবাঞ্ছিত ব্রজের রজে দেহ মিশিয়ে দেবার পরম ক্ষণ যখন এসে পড়লো, তখন দেখা গেলো বাবাজী কৃষ্ণদাসের মুখে অপার আনন্দ, পরম পরিতৃপ্তি। হাসিতে ঠোঁট দুখানি কাঁপছে। চোখেও হাসি। সারা মুখে হাসির তরঙ্গ।

না, দুঃখের লেশ মাত্র নেই। কষ্টের অনুমাত্র আভাষ নেই। শুধু প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা। পরম প্রাপ্তির অপার আনন্দ-আভাষ।

কৃষ্ণদাস বাবাজী এতক্ষণে কথা কইলেন। প্রকৃত বৈষ্ণবের গৌরব রক্ষা ক'রে মধুর হাসিভরা মুখে অদোষদর্শী কৃষ্ণদাস বাবাজী বললেন,

বাবাজী মহারাজ তবে ভুল-ই বুঝেছিলেন। তাই অমন ধারা কথা বলেছিলেন।

কিন্তু এই তো আমার দেহ ব্রজের রজলাভে কৃতার্থ হ'তে চলেছে। এই তো ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর ব্রজমণ্ডলে আমার ঠাঁই করবার ব্যবস্থা করছেন।

অপরাধী অযোগ্য হয়েও যদি দীনদয়াময়ীকে কেউ কাতরে ডাকে, তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন?

এই অকৃতী অধম তাঁকে ডেকেছে। অমনি সে ডাকে সাড়া দিলেন। কাঙালের অভিলাষ পূর্ণ করলেন।

আমার রাধারাণী যে করুণাময়ী, ক্ষমাময়ী। শরণাগত-পালিনী।

ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর জয় হোক! জয় হোক!

সারা মুখে হাসি নিয়ে অভীষ্ট-লাভে কৃতার্থ বাবাজী ব্রজমণ্ডলের পবিত্র রজে শাশ্বত আসন পাতলেন।

বাবাজীর মুখে হাসি দেখে, অপূর্ব এমনি ধারা ইচ্ছামৃত্যু দেখে, সবারই চোখের জল অন্তর্হিত হোলো। সমাগত সকলেরই মুখে অপার আনন্দ। প্রসন্নতা। সবারই আনন্দোল্লাস। সবারই কণ্ঠে জয়ধ্বনি।

ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর জয়! বাবাজী কৃষ্ণদাসের জয়!

অশ্রুতপূর্ব এই ঘটনাটি ঘটে ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে।

এতদিন কেটে গেলো।

রণবাড়ী ও আশেপাশের লোকেরা এখনও এই ঘটনার কথা সবাইকে জানায়।

এ যেন মাত্র সেদিনকার কথা।

যারা বলে, তারা যেন স্পষ্টই দেখেছে, স্বচক্ষে দেখেছে এই ঘটনা।

এই অপূর্ব ঘটনার তারা যেন সাক্ষী এক একজন।

— —

শ্রীরামচন্দ্র ও তুলসীদাস

তুলসীদাস।

যিনি রামচরিত মানস লিখে পৃথিবী-বিখ্যাত হয়েছেন, অমর হয়েছেন, সেই তুলসীদাস।

রামচরিত মানসকে লোকে বলে তুলসীদাসের রামায়ণ।

গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় লেখা। হিন্দী জানা লোকের রামচরিত মানস বুঝতে কোনও কষ্ট হয় না।

এই রামায়ণের মত আমাদের দেশে আর একখানা বইও নেই যা এত লোকে পড়ে।

তুলসীদাস। তুলসীদাস দ্বিবেদী।

আত্মারাম দ্বিবেদীর পুত্র। প্রয়াগের কাছে বান্দা জেলার রাজপুর গ্রামে আত্মারামের বাস।

রাজপুরেই জন্ম তুলসীদাসের। সে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। প্রায় সওয়া তিনশ' বছর আগেকার ঘটনা।

মা নেই। বাবা নেই। তাঁর জন্মের কিছুকাল পরেই তাঁরা গত হয়েছেন। তুলসী নিজে লিখেছেন, 'জনক জননি তজ্যো জনমি'। দুঃখকষ্ট অবহেলার মধ্য দিয়েই কেটেছে তুলসীর বাল্য-জীবন। এ ব্যথা, এ ক্ষত তাঁর ছিল জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত। তাইত তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, জগতে দারিদ্র্যের মত দুঃখ নেই। 'নহিঁ দরিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ'। আরও একটা উপলব্ধি এসেছিল তাঁর ছেলে বয়সেই। রাম কৃপা সকল রোগ—দারিদ্র্য, হিংসা এই সবই, নাশ করতে সক্ষম। 'রাম কৃপা নাসহিঁ সব রোগা'। শ্রীরামচন্দ্রের 'পরে তুলসীর আকর্ষণ তাই শিশুকাল থেকেই।

তরুণ বয়সেই বিবাহ হোলো তুলসীর। বিবাহ হোলো নিকটে। খুব নিকটেরই এক গাঁ, সেই গাঁয়েরই মেয়ে রত্নার সঙ্গে।

রত্না। রত্নাবলী।

রত্নার রূপ আছে। গুণও অশেষ। তুলসীকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। সেবা-পরিচর্যা, ভালোবাসার মধ্য দিয়েই মা বাবার অভাব, শৈশবের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একেবারে কি ভুলে যেতে পারেন তুলসী? সে যে হৃদয়ের পরতে পরতে দাগ কাটা রয়েছে। গভীর দাগ।

সে যাক্। রত্নার ভালোবাসার অন্ত নেই। সেবা-পরিচর্যায় ত্রুটি নেই। তাইতো নিরাশ্রয় তুলসীর একমাত্র অবলম্বন হ'য়ে পড়েছেন রত্না। রত্নাকে তাই তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। এক দণ্ডের জন্যেও চোখের আড়াল হ'লে জগৎ আঁধার দেখেন। লোকে বলে তুলসী স্ত্রৈণ। তা বলুক। তারা কতটুকু বোঝে! রত্নাকে কেন্দ্র ক'রেই যে তুলসীর জীবনচক্র আবর্তিত হ'য়ে চলেছে। তা' কি তারা বোঝে? না জানে?

তুলসী পুরোহিতের কাজ করেন। যজমান বাড়ী যান পূজো অর্চনা ক'রে যা পান, তাই দিয়ে সংসার চালান।

দিন গড়িয়ে যায়।

সেদিনও তুলসী যজমান বাড়ী গিয়েছেন পূজো করতে। অপরাহ্ণ থেকেই আকাশে দুর্যোগের আভাষ।

ত্রস্তপদে যজমান বাড়ী থেকে তুলসী সন্ধ্যার আগেই ফিরে এলেন। ঝড়-বৃষ্টি এলো ব'লে।

রত্না, রত্না!

আগেকার মতো রত্না তো এলেন না তুলসীর ডাক শুনে! ব্যাপার কী?

পাশের বাড়ীর একজন বললেন, রত্না বাড়ী নেই। তাঁর বাবার বড় অসুখ। সেখান থেকে লোক এসেছিল তাঁকে নিয়ে যেতে। এদিকে ঝড় জলও এসে পড়ে। তাই ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে তিনি বাবার কাছে চ'লে গিয়েছেন। তুলসীকে ব'লে যাবার সময় পান নি।

তুলসী একটুও ভাবলেন না। তক্ষুনি ছুটলেন শ্বশুরবাড়ী।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় চলছে। এখানে ওখানে বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ছে।

তুলসী চলছেন। বৃষ্টিতে কাপড় চাদর ভিজে গিয়েছে। জোর বাতাসে মাঝে মাঝে তিনি মাটিতে পড়ে যাচ্ছেন। তবুও তিনি চলছেন।......

ভিজে কাদামাখা কাপড়ে চাদরে তুলসী এলেন শ্বশুরবাড়ী। বন্ধ দুয়ারে ধাক্কা দিলেন। রত্না রত্না!

তুলসীকে এই অবস্থায় দেখে শ্বশুরবাড়ীর সবাই হেসে উঠলেন খিলখিল ক'রে। উপহাস করতে লাগলেন।

রত্নার লাগলো খুব। খুবই ছোট হ'য়ে গেলেন তিনি সকলের কাছে।

সেই ব্যথা, অপমান ঝাঁঝ হ'য়ে পড়লো তুলসীর উপরে। নিদারুণ কটু কথা কইলেন রত্না।

ছাখো, আজ আমি বুঝলাম, তোমার টান আমার 'পরে নয়। টান এই রক্তে-মাংসে গড়া দেহটার 'পরে। না, এ ভালোবাসা নয়। এ মোহ। মোহ। ছি ছি। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। আমার 'পরে তোমার যে টান তার শ'ভাগের ভাগও যদি রঘুবীরজীর উপর ফেলতে তো আমি সুখী হতাম। তুমি কৃতার্থ হ'তে।

দুয়ার বন্ধ ক'রে দিলেন রত্না। জোরে, সশব্দে।

সেই শব্দ জোরে আঘাত করলো তুলসীর হৃদয়ে।

হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তুলসী বাইরে। ঝড় জলের মধ্যে।

বাইরে ঝড়জল, দারুণ দুর্যোগ।

তুলসীর অন্তরেও কি ঝড়ের দাপট কর্ম? সেখানেও কি ঝড়ের কম মাতামাতি?

দুর্যোগের মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলে যায়। ঝিলিক মারে।

তুলসীর অন্তরেও আচম্বিতে ফুটে উঠলো ইষ্টদেব রঘুবীরের মুখ। মুহূর্তের মধ্যে, ঐ বিদ্যুতের মতোই, সে মুখখানি মিলিয়ে গেলো।

দিশেহারা যাত্রী ঘন আঁধারে পথ দেখলেন। পেলেন ইশারা।

আয়! ওরে, বেরিয়ে আয়!......রঘুবীর যেন বললেন।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, রত্না। ঠিকই বলেছো। আমি চললাম। জয় রঘুবীর!

তুলসী বেরিয়ে পড়লেন।

এর মধ্যেই রত্নার মনে এলো তীব্র অনুশোচনা। জল ছুটলো দুই চোখ দিয়ে ফোয়ারার মতো।

কী করলাম! কী বললাম! শোন, শোন!

তুলসী চলেছেন। ফিরলেন না। চলেছেন। জয় রঘুবীর!

রত্না তখনও ডাকছেন। শোন, শোন।

তুলসী চলেছেন। জয় রঘুবীর!

ঝড় থেমে গিয়েছে। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। আকাশ ফর্সা। নীল প্রশান্ত আকাশ। সে আকাশে অসংখ্য তারার মেলা।

তুলসীর মনের ঝড়ও থেমেছে। এসেছে শান্তি।

রঘুবীর ডেকেছেন! হাতছানি দিয়েছেন—আয়, ওরে আয়!

তুলসী চলেছেন। জয় রঘুবীর!

তুলসী চলেছেন। কিন্তু কোথায়? ঘরে? কাজ কি আর ঘরে? ঘরের দুয়ার তো বন্ধই ক'রে দিয়েছে রত্না—সজোরে।

যাই কাশী। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। বিশ্বনাথের কাশী। সেখানে কেউ তো উপোসী থাকে না। মনও থাকে না কারও উপোসী।

কাশীই রওনা হলেন তুলসী।

হ্যাঁ, তুলসীর অন্তরের ঝড় থেমে গিয়েছে।

জয় রঘুবীর।

তুলসী কাশীধামে এলেন।

আশ্রয় মিললো সনাতন দাসের চতুষ্পাঠীতে। অসাধারণ পণ্ডিত এই সনাতন দাস। খুবই স্নেহপরায়ণ। তুলসীকে স্নেহ করেন খুব।

এখানেই অধ্যয়ন করতে লাগলেন তুলসী।

কিন্তু রঘুবীর যে তাঁকে ডেকে এনেছেন। হৃদয়ও কেড়ে নিয়েছেন। তাই ফাঁক পেলেই রঘুবীরেব নাম কীর্তন করেন। চলে তাঁর লীলা-বিবরণ পাঠ। তুলসী নিত্য রঘুবীরের লীলারস মাধুর্যের অপার বারিধিতে অবগাহন করেন।

রঘুবীর, রঘুবীর।

দিন যায়।

সনাতন দাসের আশ্রয়ে তুলসীর আর থাকতে ভালো লাগে না।

নিভৃতি নেই এখানে। লোকের ভীড় লেগেই আছে। 'প্রাণের প্রভু রয় যে প্রাণে, রয় না বাহিরে'। নিভৃতি না হ'লে, নিরালা না পেলে, প্রাণের প্রভুকে কি পাওয়া যায়?

তুলসী চ'লে এলেন নগরীর এক প্রান্তে। নির্মাণ করলেন ছোট্ট একখানি পর্ণকুটির।

নির্জন জায়গা। প্রাণ ভ'রে ডাকো রঘুবীরকে। ভেসে যাও তাঁর মাধুর্যরস-স্রোতে।

তুলসী এখানে থেকে শাস্ত্র অনুশীলন করেন। পরম প্রিয় রঘুবীরের নাম কীর্তন করেন। সাধন-ভজন চলতে লাগলো নিষ্ঠার সঙ্গে।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন তুলসী। ভজন কুটিরের পাশে এক ঝোপের আঁড়ালে তুলসী প্রতিদিন শৌচকর্ম করেন। তার পরে ঠিক পাশের একটি কুল গাছেব গোড়ায় ঘটির অবশিষ্ট জল ঢালেন। এ তাঁর নিত্যকার অভ্যাস।

ঐ কুল গাছে থাকে এক ভূত-যোনি—ব্রহ্মদৈত্য। প্রত্যহ তুলসীর দেওয়া জলে ঐ ভূতযোনি পিপাসা মেটায়। তাই তুলসীর পরে সে খুবই সন্তুষ্ট।

একদিন গভীর রাত্রে ঐ ভূতযোনি তুলসীকে বললো,

তুলসী, তুমি এই গাছের গোড়ায় রোজ জল ঢালো। সেই জল পান ক'রে আমি তৃপ্তি পাই। তাই তোমার পরে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি কিছু প্রার্থনা করো। আমি সানন্দে তোমাকে তাই দেবো।

আমি জানিনে, আপনি কে। তবে যেই হোন, বুঝেছি, আপনি আমার কল্যাণ কামনা করেন। তাই প্রার্থনা করি, আপনি এই বর দিন, যেন আমি অচিরেই ইষ্টলাভ করতে পারি। প্রভু রঘুবীরকে স্বচক্ষে দেখতে পাই।

না, না, তা আমি পারিনে। অত শক্তি আমার নেই। তা যদি থাকতো, তবে নিজেই তো উদ্ধার পেতাম। এই গাছে ভূত-যোনি হ'য়ে থাকতাম না। তবে, হ্যাঁ। কিছুটা উপকার করতে আমি সক্ষম। যিনি তোমার ইষ্টদেবতাকে পাইয়ে দেবেন, তাঁর ঠিকানা আমি তোমায় দিতে পারি।

তুলসী ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। বললেন,

আপনি অনুগ্রহ ক'রে তাই-ই করুন। সেই মহাত্মার নাম ও ঠিকানা আমায় দিন।

ভূত-যোনি বললো, দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবে। তারই কাছে এক জায়গায় নিত্য রামায়ণ পাঠ হয়। একজন বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে

সবার আগে সেই সভায় আসেন। সারাক্ষণ রামায়ণ পাঠ শোনেন। তারপর সবার শেষে সে স্থান ত্যাগ করেন। রোজই এমনটি হয়। সেই সভাস্থলে গিয়ে সেই মহাত্মার শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমার ইষ্ট দেবতাকে লাভ করবার পথ বলে দেবেন।

অনুগ্রহ ক'রে বলুন, তিনি কে? তাঁর পরিচয় দিন দয়া ক'রে।

তিনি ছদ্মবেশী পবননন্দন হনুমান। তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপালাভ করলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তোমার ইষ্টলাভ হবে। রঘুবীর তোমায় দর্শন দেবেন।

তুলসীর বড় আনন্দ হোলো। সেই দিনই তিনি সেই সভায় গেলেন। সভা আরম্ভ হবার বেশ কিছুটা আগেই তিনি উপস্থিত হয়েছেন। দেখলেন একজন অতি বৃদ্ধকে। দেখলেন, তিনি গভীর মনোযোগে রামায়ণ পাঠ শুনছেন। সারাক্ষণ একটা কথাও কইলেন না কারও সঙ্গে। রামায়ণ পাঠ শেষে সকল শ্রোতা চ'লে গেলে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করলেন।

তুলসী বুঝলেন, ইনিই সেই ব্রাহ্মণ—ছদ্মবেশী পবননন্দন। তিনি ব্রাহ্মণের অনুগমন করতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়েই তুলসী তাঁকে প্রণাম করলেন। কাতরে তাঁকে সব কথা নিবেদন করলেন।

তুলসীর চোখে জল এলো। কাঁদতে লাগলেন।

দয়া হোলো হনুমানজীর। তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কৃপা করলেন তুলসীকে।

প্রভু রঘুবীরের দ্বার অধিকার ক'রে আছেন হনুমানজী। তিনি তুলসীর উপর প্রসন্ন হয়েছেন।

বহু-ভাগ্য তুলসীর। তিনি হনুমানজীকে এই দিন থেকে গুরুরূপে পেলেন। এই দিন থেকে হনুমানজী মানুষের বেশে তুলসীকে সাধন-পথের সংকেত প্রদান করতে লাগলেন। লাগলেন নানা উপদেশ দিতে। এই দিন থেকে সাধন-জীবনে যখনই প্রয়োজন বোধ করেছেন তুলসী, শরণাপন্ন হয়েছেন হনুমানজীর। তিনি

অকৃপণ ভাবে কৃপা বিতরণ করেছেন। তুলসীর সকল সমস্তার সমাধান করেছেন।

তুলসী সাধন-পথে এগুতে লাগলেন এমনই অভিনব উপায়ে। তুলসী ছাড়া, এমন সৌভাগ্য আর কার ভাগ্যে জুটেছে ?

তুলসী বলেন, হনুমানজী কে ? তিনিঁ যে স্বয়ং মহেশ্বর। রামনাম কীর্তনের লোভে তিনি হনুমানজীর রূপ ধারণ করেছেন।

ধীর বীর রঘুবীর প্রিয় সুধীন সমীরকুমার।
আগম সুগম সব কাজ কর করতল সিদ্ধিবিচার ॥

তুলসী বলেন, ধ্যান কর। রঘুবীরের পরম প্রিয় ধীর ও বীর পবনপুত্র হনুমানজীর ধ্যান কর। তিনি কৃপা করলে সব সাধনা, সব সিদ্ধি তোমার করতলগত হবে।

তুলসী বলেন,

প্রনবঁউ পবনকুমার খলবন পাবক জ্ঞান ঘন।
জাসু হৃদয় আগার বসহিঁ রাম সর চাপ ধর ॥

পবনকুমার হনুমানজীর বন্দনা করি। যিনি খলের বনে আগুনের মতো খলনাশকারী, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ, যাঁর হৃদয়-গৃহে ধনুর্বাণধারী রাম বাস করেন।

দিন যেতে লাগলো। যেতে লাগলো মাসের পর মাস।

তুলসী রঘুবীরের ধ্যান ক'রে চলেছেন। চলেছেন নিত্য তাঁর নাম গান ক'রে। নিত্য তাঁর লীলাবিলাসের মধুর বিবরণ পরম ভক্তি আর নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ ক'রে চলেছেন।

বড় আশা, একান্ত কামনা, ইষ্টদেব রঘুবীরের দর্শন মিলবে।

আরও দিন যায়। আরও মাস।

কিন্তু কই, এখনো তো তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোলো না! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ হোলো না!

তুলসী অধীর হ'য়ে পড়লেন।

একদিন তুলসী গিয়ে হনুমানজীকে কাতরে প্রার্থনা জানালেন, প্রভু, রঘুবীরের দর্শন লাভ যাতে অচিরে করতে পারি, তা-ই করুন। তাঁকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছিনে।

কাতর অনুনয়। চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

প্রভু, কৃপা করুন। রঘুবীরকে দর্শন করিয়ে দিন।

হনুমানজী হেসে ফেললেন।

বৎস, ফিরে যাও। আমাকে আর অনুসরণ কোরো না। আগামী পরশু শুভ রামনবমী। ঐ দিন নিজের কুটিরে বসেই তুমি প্রভুর দর্শন পাবে। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

হনুমানজীকে প্রণাম ক'রে হৃষ্টচিত্তে তুলসী কুটিরে ফিরে এলেন।

এলো রামনবমী।

ভগবান রামচন্দ্র এই তিথিতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বড় পুণ্য তিথি।

নবমী তিথি মধুমাস পুনীতা।
সুকল পচ্ছ অভিজিত হরিপ্রীতা ॥
মধ্যদিবস অতি শীত ন ঘামা।
পাবন কাল লোক বিশ্রামা ॥

সেদিন চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ নবমী। ঈশ্বরের প্রিয় অভিজিত মুহূর্তে দুপুর বেলায় যখন বেশী গরম নয়, অথচ বেশী শীতও নয়—লোকের আনন্দদায়ক এমনি পবিত্র মুহূর্তে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন।

রামনবমী।

চারিদিকে উৎসবের সমারোহ। ঘরে ঘরে আনন্দ। রামচন্দ্রের জন্মতিথি। সারা ভারতের নরনারী পরম ভক্তির সঙ্গে এই দিনটিকে স্মরণ করে।

তুলসীর মনেও আনন্দ। ব্যাকুলতা তার চাইতেও বেশী।

তিনি প্রতীক্ষা করছেন। গুনছেন দণ্ডের পর দণ্ড। উদ্বেল অধীর তিনি। ইষ্টদেব রঘুবীরকে দেখতে পাবেন।

দণ্ডকে প্রহর ব'লে মনে হয়।

কিন্তু কই, কোথায় রঘুবীর? মিথ্যা কি তবে হনুমানজীর বাক্য? না, তা কি ক'রে হবে? পরম সত্যসন্ধ পুরুষ তিনি। তাঁর বাক্য কেন মিথ্যা হবে? তবে কি আমি কোনও ত্রুটি ক'রে ফেললাম? তাই রঘুবীরের কৃপা হোলো না।

হঠাৎ বাইরে থেকে কিসের কোলাহল কাণে এলো।

ছুটে গেলেন তুলসী। তবে কি এলেন প্রভু?

না। তিনি নন। নিরাশ হ'য়ে পড়লেন।

এক বেদে আর এক বেদেনী বানর নাচ দেখাতে এসেছে। তাদের পিছনে রয়েছে সুদর্শন এক তরুণ। কাঁধে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি।

এই প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে এ কী জ্বালা! ভালো লাগে কারও?

তুলসী দুয়ার বন্ধ করতে যাবেন। বেদে আর বেদেনী ছাড়বে না। তারা বানর নাচ দেখাবেই।

তুলসীর রাগ হোলো খুব।

যাও। এক্ষুনি এখান থেকে চ'লে যাও। নাচ দেখাতে হবে না তোমাদের।

সঙ্গে সঙ্গেই কুটিরের দরজা বন্ধ হোলো।

অন্তরে জ্বলছে অনুশোচনা। তুলসী নীচ। হীন-বুদ্ধি। তাইতো ভক্তবীর পবননন্দনের বাক্যও তাঁর ভাগ্যে মিথ্যে হ'য়ে গেলো। হায়রে হতভাগ্য!

সেদিন সন্ধ্যায়ও যথারীতি রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। এসেছেন সেখানে হনুমানজী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে।

তুলসী তাঁর দুই পায়ে পড়লেন। চোখে অশ্রু-বন্যা।

প্রভু, কেন এই অ-কৃপা? কেন এই হতভাগ্য তাঁর দর্শন পেলো না?

সে কি কথা তুলসী? ভগবান রঘুবীর, মা জানকী, ঠাকুর লক্ষ্মণ আর আমি, সবাই তো তোমার কুটিরে গিয়েছিলাম। তুমি চিনতে

পারো নি! প্রভু ও মা গিয়েছিলেন বেদে আর বেদেনীর বেশে। তাঁদের ঠিক পিছনে ঠাকুর লক্ষ্মণ ছিলেন। এক তরুণের বেশ ধ'রে তিনি গিয়েছিলেন। কাঁধে ছিল তাঁর ভিক্ষার ঝুলি। আর, আমি তো বানর সেজেই গিয়েছিলাম।

হেসে ফেললেন হনুমানজী।

বিশ্বাস হোলো না? এই ছাখ না, আমাব গলায় এখনও রয়েছে দড়ির দাগ। তুমি বেদের দলকে চিনতে পারো নি। জ্যোতির্ময়-দর্শন তুমি এখনই সইতে পারবে না। তাইতো তাঁরা ছদ্মবেশেই দেখা দিয়েছিলেন।

তুলসী কেঁদে ফেললেন।

এ কী ভুল করলাম আমি! আমি প্রভুকে, মা জানকীকে, ঠাকুর লক্ষ্মণকে চিনতেই পারলাম না! এমনই হতভাগ্য আমি! হায় হায়!

বৎস, ধৈর্য হারিও না। সাধনা ক'রে চল। তবে প্রভুর চিন্ময় রাজ্যে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য লাভ করবে। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমি আজ দ্বার ছেড়ে দিলাম। তুমি সাধনা ক'রে চল!

এই দিন থেকে রাম নাম জপে ও কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন তুলসী। চলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে ভজন আর প্রার্থনা। চোখের জলে সর্বাঙ্গ ধৌত হয়। সে কী কান্না! কী সে বিলাপ!

প্রভু, দেখা দাও! দেখা দাও!

সঠ সেবক কী প্রীতী রুচি রখিহহিঁ রাম কৃপালু।
উপল কিয়ে জলযান জেহিঁ সচিব সুমতি কপি ভালু॥

হে কৃপাসুন্দর রঘুনাথ, কৃপা ক'রে আমার মতো শঠ সেবকের প্রতি তোমার অপার প্রীতি রেখো। মহাশক্তিধর তুমি। অসাধ্য তোমার তো কিছুই নেই। জলে ভাসালে শিলা। বুদ্ধিমান সচিব বানিয়েছো বানর ভালুককে। শুধু কি তাই? আমার মত অভাজনকেও করুণা করেছো, ওগো করুণাময়।

তপস্যায় সাধ মেটে না তুলসীর। রাম নাম গান, ভজন, প্রার্থনা চলছে অহরহ।

জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতারাম ॥

এ প্রার্থনা, এ গান শুধু কি মুখ-নিঃসৃত শব্দলহরী? তুলসীর সকল দেহমন, অন্তরাত্মা, তুলসীর সকল অস্তিত্ব, তুলসীর সাধন-সত্তাই হ'য়ে উঠেছে রাম নামে কেন্দ্রীভূত। রাম নামে উদ্ভাসিত। তুলসী হলেন নাম-সিদ্ধ।

তুলসী রামনাম গান করেই চলেছেন।

জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতারাম ॥

একদিন তুলসী কুটিরে ব'সে রামনাম গেয়ে চলেছেন। দেখলেন কুটিরেব পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে দুইজন শিকারী শিকার করতে চলেছেন।

এ আর নোতুন কি দেখবার?

তুলসী একবার তাকিয়ে নিজের মনে ভজন শুরু করলেন। ওদিকে গ্রাহ্যই করলেন না।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় হনুমানজীর সঙ্গে তুলসীর সাক্ষাৎ হোলো।

দেখলে? ঘোড়ায় চ'ড়ে যাঁরা গিয়েছিলেন তোমার কুটিরের পাশ দিয়ে, তাঁদের ভালো ক'রে দেখেছো তো?

কি ব্যাপার, প্রভু?

ওই দুইজনই তো হ'লেন রঘুবীরজী ও ঠাকুর লক্ষ্মণ।

আমি চিনতে পারিনি, প্রভু। বুঝতে পারি নি। হায় হায়।

দিন যায়।

তুলসীর সাধনায় বড়ই সন্তুষ্ট হলেন হনুমানজী।

তুলসী, এবার তুমি চিত্রকুট পর্বতে যাও। এই চিত্রকুট থেকেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অবতার-লীলার শুরু। পরম পবিত্র এই চিত্রকুট অঞ্চল। পরিবেশও সাধনার পক্ষে অনুকূল। চিত্রকুটে গিয়ে কিছুকাল

একমনে সাধনা কর। ব্যাকুল হোয়ো না, বৎস। শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন তুমি পাবে। আমি আবার বলছি ও কথা। তুমি ভাগ্যবান।

বৃথা কালক্ষেপ কেন? তুলসী তখনই রওনা হ'লেন চিত্রকুটের উদ্দেশ্যে।

চিত্রকুট।

তখন সূর্যগ্রহণের মেলা চলছে এখানে। নানা দিগদেশ থেকে সাধুসন্ত এসেছেন চিত্রকুটে। চিত্রকুটের সর্বত্রই রামনাম কীর্তন চলছে। চলছে রামায়ণ পাঠ।

তুলসী পাহাড়ের প্রান্তে রামঘাটে একখানি ক্ষুদ্র ভজনকুটির নির্মাণ করলেন। রইলেন সেখানে।

মেলা ভেঙ্গে গেলো। সবাই গেলেন চ'লে। অঞ্চল জনশূন্য হ'য়ে পড়লো।

তুলসীর জীবনে এখন অফুরন্ত অবকাশ। তাঁর তপস্যা তীব্রতর হোলো।

সকাল হয়। ঝরণার জলে স্নান করেন তুলসী। ঝরণার জলেই পিপাসার শান্তি। বন্যফল খেয়ে দিন কাটে। কিন্তু এহো বাহ্য। প্রকৃতপক্ষে সারাদিনই কাটে ভজনে, রাম নাম জপে।

একদিন সকালে তুলসী পূজোর আয়োজন করছেন। ঝুলি হ'তে নিয়েছেন চন্দন কাঠ ও শিলা। ঘষতে লাগলেন চন্দন।

এমন সময়ে একটি পরম সুন্দর বালক এসে দাঁড়ালো তাঁরই সম্মুখে। নয়ন-মনোহর রূপ। শিরে জটা। পরণে বল্কল। আজানুলম্বিত বাহু। সেই বাহুতে একখানি ধনু। নয়নে তার দিব্য বিভা। সারা দেহে মধুর লাবণ্যের ছটা।

বালকটি বড়ই চপল। শিকারে চলছিল নাকি! সে এসে দাঁড়ালো তুলসীর সম্মুখে। আবদার ধরলো এর মধ্যে।

তোমার নিজ হাতে আমায় চন্দন পরিয়ে দাও।

যে চন্দন রঘুবীরের জন্যে ঘষছেন, এই চঞ্চল-চূড়ামণি সেই চন্দনই চায়।

এ চন্দন রঘুবীরের জন্যে! এদিকে বালকটিও যে তুলসীর মনোহরণ করেছে!

কী ক'রে এড়াবেন? মহাবিপদে পড়লেন।

দাওনা চন্দন পরিয়ে। বিলম্ব করছো কেন?

তাইত!

বলি শুনছ? তোমার ঐ চন্দন আমায় পরিয়ে দাও না। কী সুন্দর তোমার চন্দন! কী সুন্দর তোমার ভজন গান!

তাইত!

তুমি গান করো। আর, গাইতে গাইতে আমার ললাটে, মুখে চন্দন লেপন করো। আমার ভা-রী ইচ্ছে হয়েছে, তোমার হাতের চন্দন পরতে।

আচম্বিতে তুলসীর মনে পড়লো রামনবমী দিনের কথা। মনে পড়লো সে দিনের হনুমানজীর আশীর্বাদ।—অচিরে তুমি রঘুবীরের দর্শন পাবে।

দাও না চন্দন পরিয়ে। তুমি কেমনধারা মানুষ!

গায়ে পদ্মগন্ধ! কণ্ঠে মধু-মুরলীর সুর! নবদূর্বাদল-শ্যাম বর্ণ! সব-ই তো মিলে যাচ্ছে!

অরুণ নয়ন উর বাহু বিসালা।
নীল জলজ তনু স্যাম তমালা॥
কটিপট পীত কসে বরভাথা।
রুচির চাপ সায়ক দুহুঁ হাথা॥

চোখ দুটি, আহা, পদ্মের মতো। বাহু দুখানি বিশাল। দেহ নীল পদ্মের মতো নীল ও তমাল গাছের মত শ্যাম। তাঁর কাপড় হলুদ রঙের। কোমরে কোমরবন্ধ। দুই হাতে ধনুক বাণ।

সবই মিলে যাচ্ছে! সবই মিলে যাচ্ছে! ওরে তুলসী, এ সুযোগ হারাস্ নে! চন্দনে চর্চিত কর রঘুকুল-তিলকের মুখ-পদ্ম, কম অঙ্গ!

রঘুবীরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখে ও সেই সব স্থানে বিচরণ ক'রে তুলসীর মনে রাম লীলা-মাহাত্ম্য দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হ'য়ে গেলো। দণ্ডকবনে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি তুলসীর হৃদয়ে ভাবের প্লাবন বইয়ে দিলো। সেই মধুরতম স্মৃতি ও তুলসীর হৃদয়ে তার অনুভূতি তিনি লিখলেন অনুপম ভাষায়।—

দণ্ডকবন প্রভু কীন্‌হ সোহাবন।
জন-মন অমিত নাম কিয় পাবন॥
নিসিচর-নিকর দলে রঘুনন্দন।
নামু সকল কলি কলুষ নিকন্দন॥

প্রভু রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে এসে সত্যিই এখানকার শোভা বাড়িয়ে দিয়েছেন। দণ্ডক তো একটা বন মাত্র। কিন্তু তাঁর নাম অগণিত মানুষের মনোবলকে পবিত্র ক'রে তুলেছে। সেদিন রঘুনন্দন বীর-বিক্রমে রাক্ষসকুল দমন করেছেন। তাঁর নাম কিন্তু বধ করেছে কলির পাপরূপ সকল রাক্ষসকে।

বনের মধ্যে দিয়ে রঘুবীর, সীতা ও লক্ষ্মণ চলেছেন। তুলসী তার বর্ণনা দিলেন অনুপম ভাষায়।—

উভয় বীচ সিয় সোহই কৈসী।
ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসী॥
সরিতা বন গিরি অবঘট ঘাটা।
পতি পহিচানি দেহিঁ বর বাটা॥

রাম ও লক্ষ্মণ এই দুইজনের মাঝখানে সীতা যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। নদী, বন, পর্বত, উঁচু-নীচু পথ, এরা নিজদের প্রভুকে চিনে সুন্দর রাস্তা ক'রে দিচ্ছিল।

লিখতে হবে নোতুন ক'রে রামায়ণ রাম নাম প্রচারের জন্যে। দেশের প্রতিটি লোকের হৃদয়-দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে সেই রামায়ণ। শুধু পৌঁছে দেওয়া নয়। সকল হৃদয়কে উর্বর ক'রে তুলতে হবে।

তুলসী নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুলছেন। রঘুবীরের ধ্যানে ও জপে অহরহ তিনি নিমগ্ন থাকেন।

প্রভু, আমায় উপযুক্ত ক'রে তোল। ব্রত আমার সফল কর।

ধ্যান, জপ আরও তীব্রভাবে চলতে লাগলো।

এখন তুলসীর সকল সত্তা রাম-ময়। রাম বিনা আর কিছু নেই। রাম বিনা আর কেউ নেই। তুলসীর চোখে নীল-কঞ্জ-লোচন-ভবমোচনের জ্যোতির খেলা। তাঁর মুখে সর্বদাই শ্রীরামচন্দ্রের মোহন-মঙ্গল মধুময় নাম। তাঁর অন্তরাত্মায় শ্রীরামচন্দ্রের মঞ্জুল-মঙ্গল-মোহময় মূরতি অঙ্কিত। এখন তুলসী রামময়।

তুলসী স্থির করলেন, সারা উত্তর ভারতের তীর্থগুলি ভ্রমণ ক'রে আসবেন। রামায়ণ লিখতে হবে যে! রামায়ণের উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে। প্রভুজীর আদেশ!

হ্যাঁ, অযোধ্যায়ও যেতে হবে। গেলেন অযোধ্যায়। কয়েকমাস থাকলেন সেখানে। অযোধ্যায় না থাকলে রামায়ণ লেখা যায়?

অযোধ্যায় আসবার পর থেকেই তুলসী শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেতে থাকেন বারংবার। লাভ করতে থাকেন সীমাহীন কৃপা।

তুলসী এলেন বৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনে কানু ছাড়া গীত নেই। সর্বত্রই কৃষ্ণ কথা। রাধাকৃষ্ণের লীলাগান।

তুলসী গেলেন এক মন্দির দেখতে। কিন্তু কই? মন যে তৃপ্তি পায় না। কোথায় রঘুবীর? রামময় তুলসী রঘুবীরকে না দেখে তৃপ্তি পাবেন-ই বা কেন? বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ তুলসীর হৃদয়ে আনন্দ দিতে বিফল হলেন। তুলসী বংশীধারী মদনগোপালের দিকে চেয়ে করযোড়ে মিনতি করলেন,

কহা কহৌঁ ছবি আজকী ভলে বনো যৌনাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষ বাণ লো হাথ॥

হে প্রভু, হে নাথ, আজকের এ শোভার আমি কী বর্ণনা করবো ? মধুর মোহন বেশে সেজেছ বেশ। তবুও, প্রভু, তুলসী যখন মাথা নোয়াবে, প্রণাম করবে, তোমায় কিন্তু তখন, বাঁশি নয়, ধনুর্বাণ হাতে নিতেই হবে।

সত্যিই মদনগোপাল সেদিন তুলসীর ভক্তির জোরে ধনুর্বাণ নিয়েই তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

তুলসীদাস নিজেই লিখেছেন এ কথা।

ক্রীট মুকুট মাথে ধর্যো ধনুষবাণ লিয় হাথ।
তুলসী নিজ জন কারনে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ॥

নিজ ভক্ত তুলসীদাসের মনের সাধ পূরণের জন্যে প্রভু সেদিন রঘুনাথরূপে শিরে ধরেছিলেন রাজ-কিরীট, হাতে নিয়েছিলেন ধনুর্বাণ।

আবার এলেন কাশী।

হনুমান ফটকে চতুষ্পাঠী খুললেন। পড়াতে শুরু করলেন ছেলেদের।

স্থানীয় লোকেরা এই সময়ে তুলসীর উপর অত্যাচার শুরু করলো। শুরু করলো নানা ষড়যন্ত্র।

বিরক্ত হ'য়ে তুলসী চ'লে এলেন গোপাল মন্দিরে। এখানেও থাকতে পারলেন না। এলেন চ'লে অসিঘাটে। এখানেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রইলেন। আজও সেখানে গেলে তুলসীর সাধনগুহা ও নানা স্মৃতিচিহ্ন দেখা যাবে।

এই অসিঘাটেই তুলসী রামচরিত মানস লিখতে শুরু করলেন। প্রথমে লিখছিলেন সংস্কৃত ভাষায়।

এই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেলো।

তুলসীদাস সারা দিনমানে যতটুকু রামায়ণ লিখতেন, রাত্রিকালে তা, কেমন ক'রে কে বলবে, অদৃশ্য হ'য়ে যেতো। কোথাও তার খোঁজ মিলতো না। এই রকম ঘটনা ঘটলো পর পর সাত দিন।

অষ্টম দিনে ভগবান শঙ্কর ও দেবী পার্বতী তুলসীদাসের সামনে আবির্ভূত হলেন। ভগবান শঙ্কর তুলসীদাসকে বললেন, তুলসী, অযোধ্যায় যাও। সেখানে ভগবান রঘুবীরের আবির্ভাব-স্থানে গিয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করো। আর, সহজ সরল সকলের বোধগম্য হিন্দী ভাষাতেই শুরু করো রামায়ণ লিখতে।

আমার আশীর্বাদে তোমার কবিতা সামবেদের মতোই ফলবতী হবে।

কালবিলম্ব না ক'রে তুলসী গেলেন অযোধ্যায়। ভগবান শঙ্করের নির্দেশ মতো হিন্দী ভাষাতেই রামায়ণ লিখতে লাগলেন।

কিছুদূর লেখা হ'লে ভগবান শঙ্কর পুনরায় আদেশ করলেন তুলসীকে কাশী যেতে। তুলসী কাশী চ'লে এলেন।

কাশীতে এসে সকল মনপ্রাণ দিয়ে রামচরিত মানস লিখতে লাগলেন।

প্রতিদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে ব'সে তুলসী নিজের লেখা রামায়ণ বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে শোনাতেন। রাতে মন্দিরেই সে পাণ্ডুলিপি রেখে আসতেন।

একদিন সকালবেলায় গিয়েছেন মন্দিবে। তাঁর সামনেই মন্দিরের দরজা খোলা হোলো। দরজা খোলা মাত্র তুলসী শুনতে পেলেন, আর সবাইও শুনতে পেলো, মন্দিরে কে যেন ব'লে উঠলেন, সত্যং শিবং সুন্দরম্। শুধু তাই নয়। পাণ্ডুলিপিতেও কে লিখে রেখেছেন সত্যং শিবং সুন্দরম্।

পরে তুলসী স্বপ্নযোগে জানলেন, রামায়ণ শুনে ভগবান শঙ্করই মনের আনন্দে বলেছিলেন, লিখেছিলেন ওই কথা।—সত্যং শিবং সুন্দরম্।

কৃতার্থ হলেন তুলসীদাস।

কাশী থেকে তুলসী আবার অযোধ্যায় এলেন। সেখানে এক যোগীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হোলো। প্রথম দর্শনেই যোগীবর তুলসীকে

নবযুগের বাল্মীকি ব'লে আবাহন করলেন। তাঁরই উৎসাহে ও প্রেরণায় তুলসীদাস রামচরিত মানস দ্রুত লিখতে লাগলেন।

এই যোগীরাজ যোগ শক্তি প্রভাবে সরযূ নদীর তীরে নিজের পর্ণকুটিরে দেহত্যাগ করেন। এই কুটিরে বসেই তুলসী রামচরিত মানস লিখে চললেন।

লিখতে লাগলেন রামচরিত মানস। শুধু রাম চরিত্র বর্ণনা, তাঁর লীলা কথার মধ্যেই গ্রন্থখানি সীমিত রইলো না। এর পটভূমিকা বৃহত্তর, ব্যাপকতর। নানা গ্রন্থ থেকে তুলসী এর উপকরণ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

আউধী হিন্দী ও ব্রজবুলির সংমিশ্রণে এই লেখা সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় হ'য়ে পড়লো।

তুলসী নিজে দারিদ্র্যের জ্বালা অনুভব করেছেন আশৈশব। তিনি দেখেন তাঁর চারিদিকে আর্ত, দরিদ্র, বিপন্ন জনের ভীড়। তিনি তাঁর গ্রন্থে ঘোষণা করলেন, প্রভু রঘুবীরের সেবা করতে চাও, কর মনপ্রাণ দিয়ে খিন্ন, ক্লিষ্ট ও আর্তের সেবা। এই খিন্নের, ক্লিষ্টের, আর্তের সেবাই রঘুবীরের সেবা।

বন্দউঁ সীতারাম পদ জিনহহিঁ পরম প্রিয় খিন্ন।

তুলসী এমন ভাবে, ভাষায় লিখলেন যে সারা ভারতের স্ত্রীপুরুষ এই বই প'ড়ে আশা মিটোতে পারে না। এর অন্তরের সৌন্দর্য এত বেশী হোলো যে, এ বই নিজের গুণে হিন্দুস্থানের সকল হিন্দীভাষী বা হিন্দী জানা লোকের হৃদয় অধিকার ক'রে বসলো। এমন হিন্দীভাষী চাষী আজও নেই যে এর কয়েকটা চৌপাই বা দোঁহা না জানে বা প্রয়োজন মতো উল্লেখ না ক'রে থাকে।

রাম যখন শিশু, কেবল চলতে শিখেছেন, তখনকার কথা তুলসীদাস লিখলেন—

ভোজন করত বোল জব রাজা।
নহিঁ আবত ত্যজি বাল সমাজা॥

কৌসল্যা জব বোলন জাঈ।
ঠুমুকি ঠুমুকি প্রভু চলহিঁ পরাঈ॥
ধূসর ধুরি ভরে তনু আয়ে।
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে॥
ভোজন করত চপল চিত, ইতউত অবসরু পাই।
ভাজি চলে কিলকত মুখ, দধি ওদন লপটাই॥

রাজা যখন রামকে খেতে ডাকেন তখন সঙ্গী ছেলেদের ফেলে সে আসতে চায় না। কৌশল্যা ডাকতে গেলে সে ছেলে থুপ্‌ থাপ্‌ ক'রে ছুটে পালায়। ধুলায় ধূসর ছেলেকে রাজা হেসে কোলে বসান। চঞ্চল মনে খেতে খেতে একটু ফাঁক পেলেই খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে সে পালায়। মুখে দই-ভাত লেপটে থাকে।

এই রামকে দেখতে কারও কি বাজার বাড়ী যেতে হয়? দেশ জুড়ে ঘরে ঘরে এই রাম রয়েছে যে! এই জন্যেই তুলসীর এত আদর হোলো। সবাই দেখলো—এ প্রত্যেকের নিজের ঘরের, নিজের হৃদযেব জিনিস।

বাম, লক্ষ্মণ, সীতাকে তুলসীদাস সাধাবণ লোকের একেবারে আয়ত্তের মধ্যে এনে দিলেন।

তুলসী বললেন, রামচরিত শুনলে কী হয়? এর আলোচনায় কী ফল?

রাম চরিত হোলো—কলি মল সমনি মণো মল হরনী।

এই মহান পূত চরিত্র আলোচনা করলে কলিকালে সঞ্জাত যাবতীয় মল দূর হয়। এ হোলো কলি-মলের শমন-স্বরূপ। মনের সমুদয় মল হরণ করে নেয়।

শ্রীরাম চরিত্র অনুধ্যান করা সহজ কথা নয়। কয়জনে তা পাবে? কিন্তু রামনাম করা—সে তো অতি সহজ কাজ!

তুলসীদাস বলেন, রাম নাম করো, রাম নাম করো। তাতেই সব হবে!

জান-তো—রাম নাম রাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

রাম এক তাপস-তীয় তারী।
নাম কোটি-খল-কুমতি সুধারী॥
ভজেউ রাম-আপু ভব-চাপু।
ভবভয়-ভঞ্জন নাম প্রতাপু॥

শ্রীরামচন্দ্র অহল্যা নামে এক তাপস-নারীকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম কোটি কোটি খল ও কুবুদ্ধিকে ত্রাণ করেছে। রাম হরধনু নামে একটি ধনু ভঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নামের এমনি প্রতাপ যে তাতে ভবভয় ভেঙ্গে যায়।

শ্রীরামচন্দ্র শুধু রাক্ষসগণকে বধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম কলির কলুষরূপ সকল রাক্ষসকেই বধ করে।

ব্যস্। তবে আর চাই কি! আশ্বস্ত হোলো লোক। পড়তে লাগলো শ্রীরামকথা—রামচরিত মানস সাগ্রহে।

রামচরিত সরোবরের পুষ্পবাটিকা বাগবন, সুখরূপ পাখীর বিহারের স্থান। এই বাগিচায় মন মালী সুন্দর চোখের জল ঢালে।

পুষ্প-বাটিকা বাগ বন সুখ সুবিহঙ্গ বিহারু।
মালী সুমন সনেহ দল সীঁচত লোচন চারু॥

কী অপূর্ব মধুর ভাষায় পরিবেশন করলেন তুলসী সাধারণের কাছে তাঁর প্রাণের কথা!

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লেখক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন ছত্রে ছত্রে নিজের বিনয় ও দৈন্য প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থে, তুলসীদাসও ঠিক তেমনিই নিজের কথা বলেছেন।

হোঁহু কহাবত সব কহত রাম সহত উপহাস।
সাহিব সীতানাথ সে সেবক তুলসীদাস॥

আমি বলিয়ে চলেছি আর সবাই বলছে যে, সীতানাথ হচ্ছেন প্রভু আর তুলসীদাস তাঁর সেবক। প্রভু এই উপহাস সহ্য ক'রে চলেছেন।

হায়রে!

অতি বড়ি মোর ঢিঠাঈ খোরী।
স্নুনি অঘ নরকহু নাক সিকোরী॥
সমুঝি সহম মোহিঁ অপডর অপনে।
সো স্নুধি রাম কীন্‌হ নহিঁ সপনে॥

কোথা রামচন্দ্র প্রভু, আর আমি কিনা নিজেকে দাস বলি! এই যে এত বড় ধৃষ্টতা ও দোষ, এ শুনে নরকও নাক সিট্‌কায়। আমি নিজেব ধৃষ্টতা বুঝে নিজেই ডরাই। কিন্তু এটা স্বপ্নেও গ্রাহ্য করেন না প্রভু।

স্নুনি অবলোকি স্নুচিত চখ চাহী।
ভগতি মোরি মতি স্বামি সবাহী॥
কহত নসাই হোই হিয় নীকী।
রীঝত রাম জানি জন জী কী॥

স্বামী রামচন্দ্র আমার কথা শুনে নিজের নির্মল হৃদয়ের দিব্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার ভক্তি ও মতির প্রশংসা করেন। একথা বলা মন্দই হোক আর ভালোই হোক, রামচন্দ্র লোকের হৃদয়েব কথা জেনে আনন্দ পান।

এমন দৈন্য, এমন সরলতা কার না হৃদয় স্পর্শ করে?

এই সকল কারণে রামচরিত মানস নিমেষে জনসাধারণের হৃদয় জয় ক'বে ফেললো।

কিন্তু একদল ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়লেন। ঈর্ষাই প্রধান কারণ এর। তা ছাড়া, সংস্কৃতে না লিখে কথ্য হিন্দীতে লেখা হয়েছে এই গ্রন্থ। এ-ও আর এক কারণ। এ গ্রন্থ সাধারণের কাছে সহজবোধ্য। রামায়ণকে ক'রে তুলেছে সহজ। যাঁরা রামায়ণ পাঠ ক'রে ও তার ব্যাখ্যা ক'রে জীবিকা নির্বাহ কবেন, তাঁরা ভাবনায় পড়লেন। আয় কমে যাবে। তাঁরা ষড়যন্ত্র করলেন। নানাভাবে তুলসীদাসকে নিগৃহীত করতে লাগলেন। এই অবস্থায় ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বঙ্গজননীর সন্তান মধুসূদন সরস্বতী রামচরিত মানসের পাণ্ডুলিপি প'ড়ে তুলসীকে জানালেন—

আনন্দকাননে হ্যস্মি জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী ভাতি রামভ্রমর-ভূষিতা॥

এই কাশীরূপী আনন্দবনে তুলসীদাস চলমান তুলসী তরু। তাঁর কবিতারূপী মঞ্জরী সুন্দর। এর 'পরে রামরূপী ভ্রমর সব সময়েই ব'সে থাকেন।

তুলসীদাস শ্রেষ্ঠ সাধক-পণ্ডিতের কাছ থেকে এইরূপ উৎসাহপ্রদ, সান্ত্বনাপ্রদ আশ্বাস পেয়ে প্রাণে বল পেলেন।

ষড়যন্ত্রকারীরা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করবেন ঠিক করলেন। তুলসীদাসকে জব্দ করতে হবে। তাঁরা দুজন চোরের আশ্রয় নিলেন। স্থির হোলো, তারা রামচরিত মানসের পাণ্ডুলিপি চুরি ক'রে আনবে।

তুলসী তাঁব কুটিরে রয়েছেন। গভীর ধ্যানমগ্ন তিনি। কোনও দিকে খেয়াল নেই।

চোর দুইজন এলো। তুলসীর কুটিরে প্রবেশ করতে যাবে, ঠিক এমন সময়ে তারা দেখলো এক অপূর্ব দৃশ্য। তারা দেখলো, কুটিরের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এক শ্যামল কিশোর। হাতে তাঁর ধনুর্বাণ। অঙ্গ থেকে দিব্য জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কুটিরের চারদিক ঘুরে ঘুরে সে পাহারা দিয়ে চলেছে। চোর দুইজন বার বার চেষ্টা করছে। বারবারই তারা সেই কিশোরের দৃষ্টিপথে পড়ছে।

কী আশ্চর্য! এত অল্পবয়সী কিশোর বালক! তার চোখে নেই ক্লান্তি! দেহে নেই শ্রান্তি বোধ! সারা রাত জেগে রয়েছে!

সারা রাত ধ'রে চোর দুইজন চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘরে ঢুকতে কিছুতেই পারলো না।

রাত্রি শেষ হলো। রামচরিত মানসের পাণ্ডুলিপি চুরি করা হোলো না।

ভোর হ'লেই চোর দুইজন এলো তুলসীর কাছে। জানতে চাইল, এই কিশোর বালকটি কে? তার পরিচয় কি? এমন অপূর্ব সুন্দর দেহ-কান্তি তারা জীবনে দেখে নি।

চোর দুইজন ভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়লো। আত্মগ্লানিও উপস্থিত হোলো তাদের। তারা অকপটে সব কথা জানালো তুলসীকে।

তুলসী শুনছেন আর চোখ দিয়ে দর দর ধারে জল পড়ছে। তিনি সবই বুঝেছেন।

বুকে জড়িয়ে ধরলেন তুলসী চোর দুইজনকে। আলিঙ্গন করলেন।

তোমরা ধন্য, ভাই। তোমরা ধন্য। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে তোমরা রঘুনাথজীর দর্শন পেয়েছো। দেবদুর্লভ তোমাদের ভাগ্য। তোমাদের দেখা পেয়ে, তোমাদের কথা শুনে আমিও ধন্য হয়েছি, ভাই। আর এক কথা বলি, রঘুনাথজীর দর্শন পেয়েছো, তাই তোমাদের জীবনের সব পাপ দূর হ'য়ে গিয়েছে। আজ থেকে তোমরা নিষ্পাপ।

চোর দুজন তুলসীর পায়ে পড়লো। বার বার ক্ষমা চাইলো।

রাম নাম করো ভাই। রাম নাম করো।

স্বয়ং রঘুনাথজী সারারাত জেগে কষ্ট ক'রে তুলসীর গ্রন্থ রক্ষা করেছেন। তুলসী এ কষ্ট সইতে পারলেন না। তাঁর কুটিরের বহু জিনিস দরিদ্রদের বিলিয়ে দিলেন। রামচরিত মানসের পাণ্ডুলিপি রেখে এলেন এক বন্ধুর গৃহে। না, আর রঘুনাথজীর পাহারা দেবার প্রায় কিছুই রইলো না।

এর পরেও আর একদিন তুলসীর গৃহে কয়েকজন চোর এসেছিল। তখনও যে সামান্য জিনিসপত্র ছিল সেগুলি নিয়ে যেতে।

একদিন আঁধার রাতে তুলসী ঘরে ফিরছিলেন। এমন সময়ে চোরেরা ঘিরে ফেললো।

তুলসী অবিচলিত চিত্তে হনুমানজীকে স্মরণ করলেন।

হনূমানজী তক্ষুনি উপস্থিত হ'য়ে চোর তাড়িয়ে দিলেন। তুলসীদাস লিখলেন এই দোঁহাটি।

বাসর চাস নি কৈ ঢাকা রজনী চাহুঁ দিসি চোর।
দলত দয়ানিধি দেখিয়ে, কপি কেসরী কিসোর॥

তুলসীদাস শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তাঁর আবেদন বিশ্বেশ্বরের নিকট পৌঁছুতো। তাঁর এত জোর ছিল, তিনি কখনও বা হনূমান ও ভরতকে উকীল লাগিয়ে, কখনও বা লক্ষ্মণকে দিয়ে আবেদন পাঠিয়ে কাজ সেরে নিতেন।

বিনয় পত্রিকা তুলসীদাস লেখেন। এটি লিখে রামচন্দ্রের কাছে পেশ করবার সময়ে তুলসীর ইচ্ছা হোলো যে, রঘুনাথজী যেন স্বয়ং এটি পড়েন।

বিনয় পত্রিকা দীন কী বাপু আপুহী বাঁচো।

দীনের বিনয় পত্রিকা, পিতা, তুমি নিজে প'ড়ো।

বিনয় পত্রিকার ২৭৮টি শ্লোকে হনূমান, ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে, সুযোগ পেলে সুপারিশ ক'রে তাঁরা যেন তাঁর কাজ করিয়ে দেন।

এ' বই-এর শেষ শ্লোকে তুলসী লিখলেন—

হনূমান ও ভরতের কথায় লক্ষ্মণ তুলসীদাসের দরখাস্ত প্রভুর নিকট পেশ করেন।

বিহঁসি রাম কহ্যো সত্য হৈ সুধি মৈঁ হূ লহী হৈ।

প্রভু হেসে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমিও খবর পেয়েছি।

রাম নাম প্রচারে তুলসীদাস অহরহ ব্যাপৃত থাকেন। নামের প্রভাবে তুলসী হ'য়ে উঠেছেন বাক্‌সিদ্ধ। তাঁর কণ্ঠে রামনাম হ'য়ে উঠেছে চৈতন্যময়।

কত অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগলো রাম নামের প্রভাবে!

একজন এসেছেন কাঁদতে কাঁদতে। তিনি মহাপাপ করেছেন।

ব্রহ্মহত্যা করেছেন। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ থেকে তিনি মুক্ত হবেন, জানতে এসেছেন তুলসীর কাছে।

লোকটি তুলসীর দুই পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

ভয় নেই, ভাই। রাম নাম করো। সব পাপ দূর হ'য়ে যাবে।

তুলসী তাঁর কানে রামমন্ত্র দিলেন।

ব্রাহ্মণরা ক্ষেপে গেলেন।

তুলসী ঘোষণা করলেন, এ লোক পাপমুক্ত। এমন কোনও পাপ নেই, যা রাম নামে ভস্মীভূত না হয়।

ব্রাহ্মণরা আরও ক্ষিপ্ত হলেন।

তুলসী বললেন, আপনারা বিশ্বাস করছেন না। বেশ! কী নিদর্শন পেলে আপনারা বুঝবেন, ইনি সত্যি-ই পাপমুক্ত হয়েছেন?

তারা বললেন, তুলসী, তোমার দেওয়া রাম নামের যদি এতই শক্তি, তবে তার প্রমাণ নিশ্চয়ই পাবো অলৌকিক ভাবে। এই লোকটি যদি পাথরের এই বৃষটিকে তৃণ ভোজন করাতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ, বৃষটি যদি জীবিত হ'য়ে আমাদের সামনে তা ভোজন করে, তবেই স্বীকার করবো রাম নামের মাহাত্ম্য। স্বীকার করবো তোমার দেওয়া মন্ত্রের প্রভাব। হ্যাঁ, তবেই স্বীকার করবো, এই লোকটি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে সত্যিই মুক্ত হয়েছে।

ঐ লোকটি পাথরের বৃষটিকে তৃণ খেতে দিলেন।

সমবেত জনতা দেখলো, বৃষটি জীবন্ত হ'য়ে তৃণ ভোজন করলো।

সকলে তুলসীর অলৌকিক প্রভাব দেখে বিস্মিত হোলো, মুগ্ধ হোলো। স্বীকার করলো রাম নামের শক্তি, মাহাত্ম্য।

স্বামীর সঙ্গে সহমরণে উদ্যত এক রমণীকে দেখলেন তুলসী। তাঁর কৃপা হোলো।

লোকে বলে, তুলসী এই নারীর স্বামীকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন রাম নামের প্রভাবে।

রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীটি আরও মনোরম ভাবে প্রকাশ করলেন।—

তুলসী রমণীকে বললেন,—

'ধরা ছাড়ি কেন নারী স্বর্গ চাহ তুমি।'
সাধু হাসি কহে—
'হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণীভূমি
তাঁহারি কি নহে?'

নারী বলে—স্বামী যদি পাই
স্বর্গ দূরে থাক।

তুলসী আশ্বাস দিলেন, মা, এক মাসের মধ্যেই তুমি স্বামী পাবে। এই ব'লে তিনি তাঁকে মন্ত্র দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

তুলসী প্রত্যহ
কি তাহারে মন্ত্র দেয়, নারী একমনে
ধ্যায় অহরহ।

পার হ'য়ে গেলো এক মাস।

প্রতিবেশীরা এলেন। কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

পেলে স্বামী?—নারী হাসি বলে
পেয়েছি তাঁহারে।
রয়েছেন প্রভু অহরহ আমার অন্তরে।

তুলসী এখন অতি বৃদ্ধ। বয়স হয়েছে নব্বই। মারাত্মকভাবে ব্রণ আক্রমণ করেছে।

অসিঘাটে অন্তিম সময় পর্যন্ত হনূমানজীকে ও রামচন্দ্রকে নিজের শরীরের ব্যথা জানালেন।

ভক্তের কী সে আর্তি!

রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা ক'রে তুলসী বললেন,

যখন সকল রকমে ধনহীন, বিষয়হীন ছিলাম, তখন তুমি নিজের ক'রে নিয়েছিলে। যখন মান বাড়লো, তখন আসলো অভিমান।

এতেই বুঝতে পারছি, বিষ-ফোঁড়া উপলক্ষ্য করে রাম রাজার নিমক প্রতি রোঁয়া থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

ব্যাধিতে সমস্ত হাতটা হয়ত পেকে গিয়েছিল।

সর্বশেষ অন্তিম নিবেদনে তুলসী বলছেন—বুঝেছি, আমার কর্মের ফল মিলছে। এবার আমি চুপ করলাম।

তার পর ধীরে ধীরে এই দোঁহাটি গাইতে লাগলেন—

রামনাম জস বর নিকৈ হোন চহত অব মৌন।
তুলসীকে মুখ দীজিয়ে অবহী তুলসী সৌন॥

যে জিহ্বা সর্বদাই রাম নামের যশ-গান গাইতো, আজ সেই জিহ্বা মৌন হ'তে চাইছে। আর কেন? এখন তুলসীর মুখে সবাই দাও তুলসীপাতা আর সোনা।

রাম নাম করতে করতে তুলসী এ দেহ ত্যাগ করলেন। আসন পাতলেন গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে।

রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতারাম॥

সে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

রাম বাম দিসি জানকী, লষণ দাহিনী ওর।
ধ্যান সকল কল্যাণময়, সুরতরু তুলসী তোর ॥১॥
রাম নাম মনি দীপ ধরু, জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহিরণু, জো চাহসি উজিয়ার ॥২॥

... ...

রাম নাম কলি কামতরু, সকল সুমঙ্গলকন্দ।
সুমিরত করতল সিদ্ধিসব, পগ পগ পরমানন্দ ॥১০॥
রাম নাম কলি কামতরু, রামভক্তি সুরধেনু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ, গুরুপদ পঙ্কজরেণু ॥১১॥

... ...

রাম নাম কী লুট হৈ, লুটী জায় সো লুট।
অন্তকাল পছতায়গো, প্রাণ জায়ঁ গে ছুট ॥১৬॥
রাম নাম কহবো করৌ, জবলগি ঘটমে প্রাণ।
কবহুঁ দীনদয়ালুকে, ভনক পরৈগী কান ॥১৭॥
রাম নাম রতি রাম গতি, রাম নাম বিশ্বাস।
সুমিরত সুভ মঙ্গল কুসল, চহুঁ দিসি তুলসীদাস ॥১৮॥
নাম ললিত লীলা ললিত, ললিতরূপ রঘুনাথ।
ললিত বসন ভূষণ ললিত, ললিত অনুজ সিসু সাথ ॥১৯॥
রাম ভরত লছমন ললিত, সত্রুসমন সুভনাম।
সুমিরত দসরথ সুবন সব, পূজহিঁ সব মনকাম ॥২০॥

ইতি রাম নাম রটনা ॥

———